ছোটদের বেতালের গল্প

রকিব হাসান

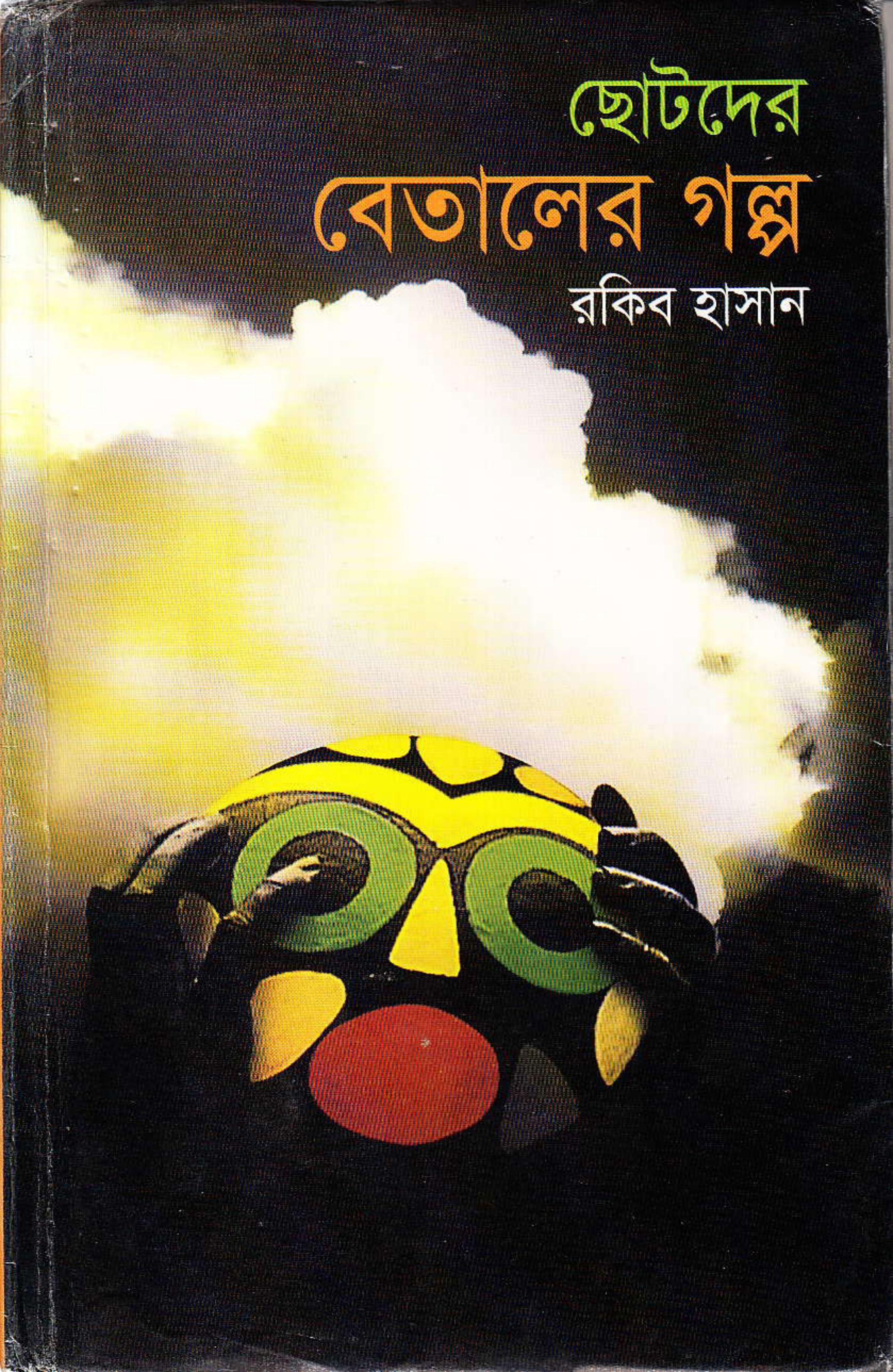

www.alorpathsala.org

আলোর পাঠশালা

School of Enlightenment

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

ছোটদের বেতালের গল্প

রকিব হাসান

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৩১২

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
আশ্বিন ১৪১৬ অক্টোবর ২০০৯

তৃতীয় সংস্করণ ষষ্ঠ মুদ্রণ
কার্তিক ১৪১৯ অক্টোবর ২০১২

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
একশত টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0311-x

সূচনা

অনেককাল আগে উজ্জয়িনী নগরে গন্ধর্বসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর ছয় ছেলে। ছেলেরা সবাই খুব গুণবান ও সব বিষয়ে সুপণ্ডিত। তাদের মধ্যে বিক্রমে, বিদ্যায় ও জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ মধ্যম পুত্র। তাঁর নাম, বিক্রমাদিত্য।

গন্ধর্বসেনের মৃত্যুর পর বড় ছেলে শঙ্কু রাজা হলেন; কিন্তু তিনি মেজো ভাই বিক্রমাদিত্যকে ভয় পেতেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন, বিক্রমাদিত্য তাঁকে হত্যা করে নিজে রাজা হবেন। এজন্য বিক্রমাদিত্যকে শেষ করে দেয়ার জন্য নানা চক্রান্ত করতে লাগলেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁর চেষ্টা সফল হলো না, বিক্রমাদিত্যই তাঁকে হত্যা করে উজ্জয়িনীর রাজা হলেন। তারপর ক্রমে বহু দেশ জয় করে, রাজা বিক্রমাদিত্য সারা জম্বুদ্বীপের অধিপতি হয়ে গেলেন।

দিন যায়। রাজা বিক্রমাদিত্য মহাসুখে রাজত্ব করছেন। একদিন তিনি ভাবলেন, আমি তো সমস্ত জম্বুদ্বীপের অধিপতি। কিন্তু আমার রাজ্যে প্রজারা কীভাবে দিন কাটায়, জানি না, নিজের চোখে দেখতে হবে। রাজা তখন তাঁর ছোট ভাই ভর্তৃহরির হাতে রাজ্যের ভার দিয়ে, সন্ন্যাসীর বেশে রাজ্যভ্রমণে বের হলেন।

কিন্তু ভর্তৃহরির ভাগ্যে বেশিদিন রাজত্ব করা হলো না। স্ত্রীর দুর্ব্যবহারে সংসারের ওপর তার বৈরাগ্য জন্মাল। তিনি সন্ন্যাসী হয়ে বনে চলে গেলেন। রাজা বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন শূন্য পড়ে রইল।

এই সংবাদ দেবরাজ ইন্দ্রের কানে পৌছল। তিনি উজ্জয়িনী নগর রক্ষার জন্য এক যক্ষকে নিযুক্ত করলেন। যক্ষ দিনরাত নগর পাহারায় ব্যস্ত রইল।

ওদিকে রাজা বিক্রমাদিত্য এ-সবের কিছুই না জেনে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর প্রজাদের অবস্থা দেখছেন। তারপর একদিন শুনলেন, ভর্তৃহরি সন্ন্যাসী হয়ে বনে গেছেন; উজ্জয়িনীর সিংহাসন শূন্য পড়ে আছে। শোনামাত্র আর কালবিলম্ব না করে রাজা রাজধানীর উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

গভীর রাতে বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীতে পৌঁছলেন। তোরণ দিয়ে নগরে প্রবেশ করতে যাবেন, এমন সময় যক্ষ তার পথরোধ করে জিজ্ঞেস করল, তুই কে? কোথায় যাচ্ছিস? তোর নাম কী?

বিক্রমাদিত্য জবাব দিলেন, আমি রাজা বিক্রমাদিত্য; নিজের রাজধানীতে যাচ্ছি। তুই কে? কেন আমার পথরোধ করছিস?

যক্ষ বলল, দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে আমি এই নগর পাহারা দিচ্ছি। তার অনুমতি না পেলে, আমি তোকে এই নগরে ঢুকতে দেব না। তবে তুই যদি সত্যিই রাজা বিক্রমাদিত্য হোস, আমার সাথে যুদ্ধ করে তার প্রমাণ দে। তারপর নগরে যেতে দেব।

বিক্রমাদিত্য যক্ষের কথা শুনে তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করতে তৈরি হলেন। উভয়ের ঘোর যুদ্ধ হলো। শেষে রাজা বিক্রমাদিত্য যক্ষকে পরাস্ত করে তাকে মাটিতে ফেলে তার বুকের ওপর চেপে বসলেন।

তখন যক্ষ বলল, তুমি আমায় পরাজিত করলে। তোমার বিক্রম দেখে বুঝলাম, তুমিই রাজা বিক্রমাদিত্য। এখন তুমি আমাকে ছেড়ে দিলে আমি তোমার প্রাণ বাঁচাব।

যক্ষের কথা শুনে বিক্রমাদিত্য হেসে বললেন, তুই পাগল। নইলে এমন অদ্ভুত কথা কেউ বলে। আমার প্রাণ তুই কি বাঁচাবি? ইচ্ছে করলে, আমিই এখন তোকে মেরে ফেলতে পারি।

যক্ষ হেসে বলল, মহারাজ যা বলছি, সত্যি বলছি। আমি যেভাবে বলব, সে-ভাবে কাজ করলে, তুমি বহুকাল বাঁচবে ও নিরাপদে অনেক বছর রাজত্ব করতে পারবে।

যক্ষের কথায় বিক্রমাদিত্য অবাক হলেন। তিনি যক্ষকে ছেড়ে দিলে সে উঠে বসল। রাজা তার কথা শোনার অপেক্ষায় রইলেন। যক্ষ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বলল :

মহারাজ, শুনুন। ভোগবতী নগরে চন্দ্রভানু নামে এক শক্তিশালী রাজা ছিলেন। একদিন রাজা বনে শিকারে গিয়ে দেখলেন, এক তপস্বী গাছের ডালে বাদুড়ের মত উল্টো হয়ে ঝুলে থেকে ধূমপান করছে। এতে রাজা খুব অবাক হলেন। রাজা সেখানকার লোকের কাছে অনুসন্ধান করে জানলেন, তপস্বী অনেকদিন ধরে ওভাবে তপস্যা করছে। সে কারও সাথে কথা বলে না। এতে রাজার বিস্ময়ের সীমা রইল না। তিনি তপস্বীর কথা ভাবতে ভাবতে রাজধানীতে ফিরে এলেন এবং পরদিন রাজসভায় সবাইকে ওই কাহিনী শোনালেন। শুনে সভাসদরাও অবাক। তারপর রাজা বললেন, যে এই অদ্ভুত তপস্বীকে আমার সভায় আনতে পারবে, তাকে লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার দেব। রাজার কথা সারা রাজধানীতে ছড়িয়ে পড়ল। ওই নগরে এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। সে শুনে রাজসভায় গিয়ে বলল,

মহারাজ! আপনার অনুমতি পেলে আমি ওই তপস্বীকে রাজসভায় আনতে পারি। রাজা তখনই অনুমতি দিলেন। মেয়েটি তপস্বীকে রাজসভায় আনতে বনে চলে গেল। দেখল, রাজা চন্দ্রভানু যেমন বলেছেন, ঠিক তেমনভাবেই তপস্বী গাছের ডালে পা লাগিয়ে মাথা নীচের দিকে দিয়ে ধূমপান করছে। তপস্বীর শরীর অস্থিচর্মসার। সে কারও সাথে কথা বলে না। এ অবস্থায় তার তপ ভঙ্গ করা কঠিন। মেয়েটি তখন অনেক ভেবে এক উপায় বের করল। সে ওই বনেই তপস্বীর কাছ থেকে কিছুদূরে খুব সুন্দর বাগানে ঘেরা একটা ঘর বানাল। তারপর প্রতিদিন সুস্বাদু মোহনভোগ তৈরি করে এনে তপস্বীর মুখে দিতে লাগল। একে তপস্বী বহুকাল অনাহারে ছিল, তার ওপর সুস্বাদু মোহনভোগ, একটু একটু করে সে সবই খেয়ে ফেলে। রোজ রোজ এভাবে মোহনভোগ খেয়ে তপস্বী মোটাতাজা হলো ও তার শরীরে শক্তি ফিরে এল। একদিন চোখ মেলে মেয়েটাকে দেখে গাছ থেকে নেমে তপস্বী জিজ্ঞেস করল, তুমি কে? একা এই বনে কী করছ? মেয়েটি বলল, আমি দেবকন্যা। তপস্যা করার জন্য এই বনে এসেছি। আমি আপনার আশ্রমের কাছেই থাকি। আমার বড় সৌভাগ্য যে আপনার সাথে দেখা হলো। আমি ধন্য হলাম! তপস্বী বলল, আমি তোমার ব্যবহারে খুবই সন্তুষ্ট। তোমার আশ্রম দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। তোমার যদি কোনও আপত্তি না থাকে, আমাকে সেখানে নিয়ে চলো। মেয়েটি খুশিমনে তপস্বীকে নিজের ঘরে এনে ভাল ভাল ফল, শরবত এ-সব খেতে দিল। তপস্বী খেয়ে তৃপ্ত হলো। মেয়েটির আদর-যত্নে সে এতটাই মুগ্ধ যে, আর নিজের আশ্রমে ফিরল না, তপস্যাও ওখানেই শেষ। মেয়েটিকে বিয়ে করে তার ঘরেই থেকে গেল। তারপর যথাসময়ে তাদের একটি ছেলে হলো। দিন যায়। তপস্বী এখন ঘোর সংসারী। মেয়েটি একদিন তপস্বীকে বলল, এতদিন তো সংসার করলাম; এবার মনে হচ্ছে তীর্থে যাওয়া উচিত। চলো, যাই। তপস্বী রাজি হলো। মেয়েটি তখন তাদের ছেলেটিকে তপস্বীর কাঁধে চড়িয়ে রাজা চন্দ্রভানুর রাজধানীতে গিয়ে সোজা রাজসভায় ঢুকল। রাজা মেয়েটিকে চিনতে পেরে সভাসদদের বললেন, দেখ দেখ, মেয়েটি ঠিকই তপস্বীকে নিয়ে এসেছে! আমি ওর বুদ্ধি দেখে সত্যিই অবাক! রাজার কথায় তপস্বীর চৈতন্য হলো। বুঝল, চন্দ্রভানু মেয়েটিকে পাঠিয়ে কৌশলে তাকে গাছ থেকে নামিয়ে তার তপস্যা ভঙ্গ করেছে। নিজের বোকামির জন্য তপস্বী নিজের ওপরই রেগে গেল। রাজার ওপরও তার ভীষণ রাগ হলো। কাঁধের ছেলেটিকে মাটিতে ছুড়ে ফেলে রাগে কাঁপতে কাঁপতে সে অন্য বনে চলে গেল। সেখানে গিয়ে আরও মনোযোগ দিয়ে কঠোর তপস্যা করতে লাগল। তারপর সিদ্ধি লাভ করে রাজা চন্দ্রভানুকে মেরে ফেলল।

গল্প শেষ করে যক্ষ বলল, মহারাজ! তুমি, চন্দ্রভানু এবং ওই তপস্বী এক নগরে, এক নক্ষত্রে ও এক লগ্নে জন্মেছিলে। তুমি রাজার ঘরে জন্মে রাজ্য শাসন করছ, চন্দ্রভানু তেলি হয়েও ভাগ্যবলে ভোগবতী নগরের রাজা হয়েছিলেন, আর ওই তপস্বী কুমারের ছেলে হয়েও তপস্যাবলে রাজা চন্দ্রভানুকে হত্যা করে তাকে বেতাল বানিয়ে শ্মশানের এক শিরীষগাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখেছে। এখন সে তোমাকে হত্যার চেষ্টায় আছে। তা করতে পারলেই তার ইচ্ছে সফল হয়। তুমি যদি ওই তপস্বীর হাত থেকে রক্ষা পাও, তাহলে বহুকাল পরম সুখে ও নির্বিঘ্নে রাজত্ব করতে পারবে। মহারাজ! তুমি এ-সব কথা জানতে না। আমি তোমাকে জানিয়ে সাবধান করে দিলাম। আর এভাবেই তোমার প্রাণ রক্ষা করলাম। বলে যক্ষ তার নিজের জায়গায় চলে গেল।

বিক্রমাদিত্য অবাক হয়ে যক্ষের কথাগুলো ভাবতে ভাবতে রাজবাড়িতে প্রবেশ করলেন। পরদিন সকালে সিংহাসনে বসলে সভাসদ ও প্রজারা তাঁকে দেখে খুব খুশি হলো। সারা রাজ্যে উৎসবের ধুম পড়ে গেল।

দিন যায়। বিক্রমাদিত্য মহাসুখে রাজত্ব করছেন, প্রজারাও মহানন্দে তাঁর রাজ্যে বাস করছে। চারদিকে বিক্রমাদিত্যের জয়-জয়কার।

একদিন সকালে পাত্র-মিত্র সভাসদদের নিয়ে রাজা সভায় বসে আছেন, এমন সময় এক সন্ন্যাসী এসে তাঁকে একটা বেল দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। রাজাও সন্ন্যাসীর কাছ থেকে বেলটি হাত পেতে নিলেন। রাজার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে সন্ন্যাসী চলে গেলেন। রাজার সন্দেহ হলো—যক্ষ যার কথা বলেছিল, এ বোধহয় সেই তপস্বী। তাঁকে মারতে এসেছে। বেলে বিষ থাকতে পারে। এই বেল খাওয়া উচিত নয়। রাজা ভাণ্ডারীকে বেলটি রেখে দিতে হুকুম দিলেন। ভাণ্ডারী রাজার হুকুম পালন করল।

পরদিন আবার সন্ন্যাসী রাজসভায় এলেন। আগের দিনের মতো সেদিনও রাজাকে বেল দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। রাজাও বেলটি ভাণ্ডারীকে রাখতে দিলেন।

এভাবে সন্ন্যাসী প্রতিদিন রাজসভায় এসে রাজাকে বেল দিয়ে আশীর্বাদ করে যান। রাজাও ভাণ্ডারীকে তা রেখে দিতে বলেন।

একদিন রাজা তাঁর বন্ধুদের সাথে নিয়ে ঘোড়াশাল দেখতে গেছেন। সন্ন্যাসী সেখানে গিয়েও রাজাকে একটি বেল দিয়ে আশীর্বাদ করলেন; কিন্তু রাজা বেলটি হাতে নেয়ার সময় হঠাৎ মাটিতে পড়ে ভেঙে গেল। বেলের ভিতর থেকে উজ্জ্বল একটা রত্ন বেরিয়ে পড়ল। রাজা ও তাঁর বন্ধুরা দেখে অবাক। এমন উজ্জ্বল রত্ন তাঁরা আগে কখনও দেখেননি। রাজা সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমাকে এমন মূল্যবান রত্ন দিলেন কেন?

সন্ন্যাসী বললেন, মহারাজ! শাস্ত্রে আছে; রাজা, গুরু, জ্যোতিষী ও চিকিৎসকের কাছে খালি হাতে যেতে নেই। তাই আমি আপনার কাছে রত্নগর্ভ বেল নিয়ে আসি। আমি আপনাকে যত বেল দিয়েছি, সবগুলোতেই একটি করে রত্ন আছে।

সন্ন্যাসীর কথা শুনে রাজা ভাণ্ডারীকে আগের বেলগুলো আনতে বললেন। ভাণ্ডারী বেল নিয়ে এলে, ভেঙে দেখা গেল, সন্ন্যাসীর কথাই ঠিক। প্রতিটি বেলের মধ্যে একটি করে মূল্যবান উজ্জ্বল রত্ন আছে।

রাজা সন্ন্যাসীকে নিয়ে রাজসভায় এলেন। তারপর জহুরিকে ডেকে রত্নগুলোর দাম যাচাই করতে দিলেন। জহুরি দেখে বলল, মহারাজ! একেকটি রত্নের দাম কোটি টাকার বেশি।

রাজা সন্ন্যাসীকে সিংহাসনে নিজের পাশে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি সন্ন্যাসী হয়ে এমন মহামূল্য রত্ন কোথায় পেলেন? আর আমাকেই-বা এগুলো দিচ্ছেন কেন? আপনার কোনও গোপন ইচ্ছে থাকলে বলুন, আমি যথাসাধ্য পূরণ করার চেষ্টা করব।

সন্ন্যাসী বললেন, মহারাজ! সভায় এত লোকের সামনে বলা যাবে না।

রাজা সন্ন্যাসীকে নিয়ে উঠে গেলেন। একান্তে এসে সন্ন্যাসী বললেন, মহারাজ! গোদাবরী নদীর তীরে এক শ্মশানে আমি মন্ত্রসাধন করব। তাতে আমার অষ্টসিদ্ধিলাভ হবে। আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আপনি একদিন সেখানে গিয়ে সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত আমার কাছে থাকবেন। তাহলে আমার সিদ্ধিলাভে সাহায্য হবে।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, কবে যেতে হবে বলুন।

সন্ন্যাসী বললেন, আগামী ভাদ্রকৃষ্ণ-চতুর্দশীতে সন্ধ্যাবেলা আপনি একা আমার কাছ যাবেন।

রাজা কথা দিলেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; আমি যাব।

সন্ন্যাসী চলে গেলেন।

তারপর ভাদ্র মাসে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর দিন এল। কথামত সন্ধ্যাবেলা রাজা বিক্রমাদিত্য একটা তলোয়ার নিয়ে একা শ্মশানে গিয়ে দেখেন সন্ন্যাসী যোগাসনে বসে আছেন। তাকে ঘিরে অসংখ্য বিকটাকার ভূত, প্রেত, শঙ্খিনী, ডাকিনী মহানন্দে নেচে বেড়াচ্ছে। সন্ন্যাসীও দুই হাতে দুটি মরার মাথা নিয়ে খোল বাজানোর মতো বাজাচ্ছেন। তবে এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখেও রাজা ভয় পেলেন না। ভক্তিভরে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে বললেন, সন্ন্যাসীবাবা, আমি এসেছি; আমাকে কী করতে হবে হুকুম করুন।

সন্ন্যাসী বললেন, মহারাজ! সৎ লোকেরা কখনও কথার বরখেলাপ করেন না। আপনি কথা রেখেছেন, আমার কাছে এসেছেন, আমি আপনার ওপর খুবই সন্তুষ্ট। এখন আমাকে একটা কাজ করে দিলে কৃতজ্ঞ হব।

রাজা বললেন, আমি আপনার যে-কোনও অনুরোধ রক্ষা করতে রাজি।

সন্ন্যাসী বললেন, এখান থেকে দক্ষিণে দুই ক্রোশ দূরে এক শ্মশান আছে। সেই শ্মশানের শিরীষগাছে একটা লাশ ঝুলানো আছে দেখবেন। আপনি গিয়ে ওই লাশটি আমাকে এনে দিন।

রাজা তখুনি লাশ আনতে দক্ষিণের শ্মশানে চললেন।

কৃষ্ণচতুর্দশীর ঘোর অন্ধকার রাত। দুই হাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না। তার ওপর আবার আকাশে ঘন মেঘ, ঝরঝর ধারায় বৃষ্টি। চারপাশে ভূত-প্রেতের হট্টগোল। এমন অবস্থায় কার না ভয় হয়? রাজা কিন্তু নির্ভয়ে চলেছেন। দক্ষিণের শ্মশানের কাছে যতই এগোন, ভূত-প্রেতের দৌরাত্ম্য ততই বাড়ে।

রাজা শ্মশানে ঢুকে এক ভয়ংকর দৃশ্য দেখলেন। কোথাও বিকটমূর্তি ভূত-প্রেতেরা জীবন্ত মানুষ ধরে খাচ্ছে; কোথাও ডাকিনীরা ছেলেমেয়ে ধরে চিবুচ্ছে। রাজা সেসব অগ্রাহ্য করে খুঁজতে খুঁজতে শিরীষগাছের কাছে গিয়ে দেখলেন, গাছটির গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত ধক্-ধক্ করে জ্বলছে; ভয়ানক মার্-মার্, কাট্-কাট্ শব্দ হচ্ছে।

রাজা শিরীষগাছের তলায় গিয়ে দাঁড়ালেন। দেখলেন, গাছের ডাল থেকে একটা দড়িতে বাঁধা মৃতদেহ ঝুলছে। গাছে উঠে তিনি দড়ি কেটে দিলেন। মাটিতে পড়েই লাশটি কেঁদে উঠল। রাজা অবাক। তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে লাশের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? কাঁদছ কেন?

লাশ তখন হো হো করে হেসে উঠল।

এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে রাজা আরও অবাক। বুঝতে না পেরে রাজা নানা কথা ভাবছেন। এই অবসরে লাশ গাছে উঠে আবার আগের মত দড়িতে ঝুলতে লাগল। রাজাও গাছে উঠে লাশের দড়ি কেটে দিলেন। তবে এবার আর মাটিতে পড়তে দিলেন না। লাশটাকে কাঁধে নিয়ে গাছ থেকে নামলেন। তারপর তার দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু লাশ জবাব দিল না। রাজা অনুমান করলেন—এটা সেই তেলিরাজা চন্দ্রভানুর লাশ, যার কথা যক্ষ বলেছিল। আর ওই সন্ন্যাসী হলো তপস্বী, যে জাতে কুমার। মন্ত্রসিদ্ধির জন্য চন্দ্রভানুর লাশ গাছে ঝুলিয়ে রেখেছে।

রাজা লাশটাকে কাঁধে করে শ্মশানে সন্ন্যাসীর কাছে নিয়ে চললেন। অর্ধেক পথ পার হলে লাশের ভিতরের বেতাল অর্থাৎ ভূত কথা বলে উঠল, ওহে বীরপুরুষ, তুমি কে? আমাকে কীজন্য, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

রাজা জবাব দিলেন, আমি রাজা বিক্রমাদিত্য। শান্তশীল নামে এক সন্ন্যাসীর কাছে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। তিনি এখন এক শ্মসানে তপস্যা করছেন।

বেতাল বলল, মহারাজ! মূর্খ ও নির্বোধরা ঘুমিয়ে, আলসেমি করে ও ঝগড়া-বিবাদে অহেতুক সময় নষ্ট করে। কিন্তু পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান মানুষ শাস্ত্রচিন্তা ও সৎকাজ করে সময় কাটায়। তাই সারা পথ চুপচাপ না গিয়ে আমি বরং আপনাকে একটি একটি করে গল্প শোনাই। প্রতিটি গল্পের শেষে আমি আপনাকে প্রশ্ন করব। আপনি যদি তাঁর ঠিক ঠিক জবাব দিতে পারেন, তাহলে আমি গিয়ে গাছে উঠব। আর যদি ভুল জবাব দেন, আপনি বুক ফেটে মারা যাবেন।

অগত্যা রাজা বেতালের কথায় রাজি হলেন। তখন বেতাল তার গল্প আরম্ভ করল :

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

প্রথম গল্প

বেতাল বলল, মহারাজ, শুনুন। বারাণসী নগরে প্রতাপমুকুট নামে মহাক্ষমতাধর এক রাজা ছিলেন। তাঁর রানীর নাম ছিল মহাদেবী, আর পুত্রের নাম বজ্রমুকুট। রাজা-রানী রাজকুমারকে খুব ভালবাসতেন। একদিন বজ্রমুকুট মন্ত্রীপুত্রের সঙ্গে বনে হরিণ শিকারে বেরোল। ঘুরে ঘুরে তারা বনের ভিতরের এক সুন্দর পুকুর পাড়ে এসে পড়ল। সেখানে ছিল একটা বকুল গাছ। দুই বন্ধু সেই গাছের নীচে তাদের ঘোড়া বেঁধে পুকুরে নেমে প্রথমে গোসল করল। তারপর পুকুরের কাছ থেকে সামান্য দূরে মহাদেবের মন্দিরে পূজা করতে ঢুকল। কিছুক্ষণ পর, প্রথমে রাজকুমার বেরিয়ে এল।

সেসময়ে এক অপরূপ সুন্দরী রাজকন্যা ও তার সখিরা এসেছিল পুকুরে স্নান করতে। অন্যপাড়ে গাছের ছায়ায় তারা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ রাজকুমার বজ্রমুকুট ও রাজকুমারীর চোখাচোখি হলো। রাজকুমারীর রূপে বজ্রমুকুট মোহিত হলো। রাজকুমারীও রাজকুমারকে দেখে মুগ্ধ। তার চুলে গোঁজা পদ্মফুলটি হাতে নিয়ে সে প্রথমে তার কানে ছোঁয়াল। তারপর দাঁতে কেটে পায়ের কাছে ফেলল। তারপর আবার তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরল। শেষে রাজকুমারের দিকে বারবার ফিরে তাকাতে তাকাতে সখিদের নিয়ে চলে গেল।

বজ্রমুকুট অস্থির হয়ে পড়ল। মন্ত্রীপুত্র মন্দির থেকে বেরিয়ে এলে বলল, বন্ধু! এইমাত্র একটা মেয়েকে দেখলাম। তার রূপের কোনও তুলনা নেই। কিন্তু সে কে, কোথায় তার বাড়ি, কার মেয়ে আমি কিছুই জানি না। তাকে বিয়ে করতে না পারলে আমি এই প্রাণ আর রাখব না।

শিকার করা আর হবে না বুঝে মন্ত্রীপুত্র রাজকুমারকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল।

রাজকুমার আহার-নিদ্রা ত্যাগ করল। নির্জনে একা বসে বসে ভাবে, কারও সঙ্গে মেশে না, কথা বলে না, কাজকর্ম কিছুই করে না।

মন্ত্রীপুত্র বন্ধুর এই দুর্দশা দেখে কাতর হয়ে পড়ল। সে মেয়েটিকে রাজকুমারের মন থেকে ভোলানোর অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু লাভ হলো না। রাজপুত্রের এক কথা, মেয়েটিকে তার চাই।

মন্ত্রীপুত্র শেষে জিজ্ঞেস করল, বন্ধু! যাবার সময় সেই মেয়ে কি তোমাকে কিছু বলেছিল? তুমিও কি কোন কথা দিয়েছিলে?

রাজপুত্র বলল, না, বন্ধু! আমিও তাকে কিছু বলি নি; সে-ও আমাকে কিছু বলে নি।

মন্ত্রীপুত্র বলল, তাহলে তাকে খুঁজে বের করব কী করে?

রাজপুত্র বলল, আমি জানি না। তাকে বিয়ে করতে না পারলে এ-জীবন আমি আর রাখব না।

তখন মন্ত্রীপুত্র অনেক ভেবেচিন্তে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, মেয়েটি কি কোনও ইঙ্গিত করেছে?

পদ্মফুল নিয়ে মেয়েটি কী করেছিল, রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্রকে জানাল। শুনে মন্ত্রীপুত্রের মুখ উজ্জ্বল হলো। বলল, বন্ধু! তোমার আর কোনও ভাবনা নেই। আমি ওই পদ্মফুলের কথা থেকে তার বিষয়ে সবই জেনে গেছি। তোমাদের মিলন ঘটিয়ে দেব। তুমি অধীর হয়ো না।

রাজপুত্র বলল, বন্ধু! তুমি কী করে বুঝলে, সব খুলে বলো আমাকে। শুনে মন শান্ত করি।

মন্ত্রীপুত্র বলল, মেয়েটি মাথা থেকে পদ্মফুল নিয়ে কানে রেখে বুঝিয়েছে, কর্ণাটনগরে তার বাড়ি। দাঁত দিয়ে ফুলে কামড় দিয়ে বুঝিয়েছে, সে দন্তবাট রাজার মেয়ে। পায়ের কাছে ফুল ফেলে বুঝিয়েছে, তার নাম পদ্মাবতী। আর, সবশেষে ফুলটিকে বুকে চেপে ধরে বুঝিয়েছে, সে তোমাকে ভালবেসে ফেলেছে।

মন্ত্রীপুত্রের কথা শুনে রাজপুত্রের আনন্দের সীমা রইল না। বলল, বন্ধু! তাড়াতাড়ি কর্ণাটনগরে চলো!

তখন দুজনে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে কর্ণাটনগরে রওনা হলো। কিছুদিন পর সেখানে পৌঁছে নগরের পথ দিয়ে যেতে যেতে দেখল, এক বৃদ্ধা তার বাড়ির দরজায় চুপ করে বসে আছে। দুজনে ঘোড়া থেকে নেমে তার কাছে গিয়ে বলল, মা! আমরা বিদেশী বণিক। বাণিজ্যের জন্য এখানে এসেছি। আমাদের জিনিসপত্র সব পরে আসছে। যদি দয়া করে তোমার বাড়িতে আমাদের কয়েক দিন থাকতে দাও, বড় উপকার হয়!

দুজনের সুন্দর চেহারা ও মধুর ব্যবহারে খুশি হয়ে বৃদ্ধা বলল, বাবারা, এ বাড়ি তোমাদেরই। যতদিন ইচ্ছে থাকো!

দুই বন্ধু বৃদ্ধার বাড়িতে উঠল। কথায় কথায় মন্ত্রীপুত্র জিজ্ঞেস করল, মা! তোমার কে কে আছে? তোমার সংসার কি করে চলে?

বৃদ্ধা বলল, আমার ছেলে রাজ-সরকারে চাকরি করে। রাজা তাকে বড় ভালবাসেন। পদ্মাবতী নামে রাজার এক মেয়ে আছে। আমি তার ধাত্রী ছিলাম। এখন বুড়ি হয়েছি, সে-জন্য বাড়িতেই থাকি। রাজা দয়া করে

আমার খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করেন। রাজকন্যা আমাকে ভীষণ ভালবাসে। আমি রোজ তাকে একবার করে দেখতে যাই।

মন্ত্রীপুত্র বলল, কাল যখন রাজবাড়িতে যাবে আমাকে বলবে। আমি তার কাছে একটা খবর পাঠাব।

বৃদ্ধা বলল, জরুরি হলে এখুনি বলো; আমি রাজকন্যাকে জানিয়ে আসি।

মন্ত্রীপুত্র বৃদ্ধাকে বলল, তুমি রাজকন্যাকে বলবে, শুক্লাপঞ্চমীতে বনের ভিতর পুকুরপাড়ে যে রাজকুমারকে দেখেছিলে, সে এসেছে।

রাজকুমারের কথা শুনে তখনই বৃদ্ধা লাঠি ভর দিয়ে রাজবাড়িতে চলল। অন্দরমহলে গিয়ে দেখল, রাজকন্যা একা বসে আছে। সে বৃদ্ধাকে আদর করে বসতে দিল। বৃদ্ধা বলল, মা, তোমাকে কত যত্নে মানুষ করেছি। এখন বড় হয়েছ। উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ে হওয়া উচিত। শুক্লাপঞ্চমীতে পুকুরপাড়ে যে রাজপুত্রকে দেখেছিলে, সে আমার বাড়িতে এসেছে। এই খবর দিতে আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছে।

বৃদ্ধার কথা শুনে রাজকন্যা দুই হাতে চন্দন মেখে, বৃদ্ধার দুই গালে চড় মেরে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল। বৃদ্ধা অপমানিত হয়ে মুখ কালো করে বাড়ি ফিরে সব জানাল। রাজকুমার হতাশ হয়ে মন্ত্রীপুত্রকে বলল, বন্ধু এখন কী করি? আমার ওপর রাজকন্যা রেগে আছে। সে-জন্য বৃদ্ধা মাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের মিলনের আর কোনও উপায় রইল না।

মন্ত্রীপুত্র বলল, বন্ধু! তুমি রাজকুমারীর মনের কথা বুঝতে না পেরে বৃথা দুঃখ পাচ্ছ। রাজকুমারী অসম্ভব বুদ্ধিমতী। হাতে চন্দন মেখে বৃদ্ধার দুই গালে চড় মেরে দশ আঙুলের দাগ ফেলে বুঝিয়েছে শুক্লপক্ষের আর দশ দিন বাকি। দশ দিন পর কৃষ্ণপক্ষে তার সঙ্গে তোমার দেখা হবে।

শুক্লপক্ষ শেষ হলো। বৃদ্ধা আবার রাজকন্যার কাছে গিয়ে রাজকুমারের কথা তুলল। রাজকুমারী বৃদ্ধার ঘাড় ধরে তাকে খিড়কির দরজা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিল। বৃদ্ধা আবার অপমানিত হয়ে মুখ কালো করে ফিরে এসে সব জানাল। শুনে রাজকুমার হতাশ হয়ে পড়ল।

কিন্তু মন্ত্রীপুত্র বলল, বন্ধু। তোমার দুর্ভাবনার কোনও কারণ নেই। রাজকুমারী ঘাড় ধরে বৃদ্ধাকে খিড়কি পথে বের করে দিয়ে বুঝিয়েছে, আজ রাতে তোমাকে খিড়কি দিয়ে অন্দরমহলে যেতে হবে।

মন্ত্রীপুত্রের কথা শুনে রাজকুমার আনন্দে অধীর হয়ে সূর্যাস্তের অপেক্ষা করতে লাগল। সাঁঝ গড়িয়ে রাত হলো। রাজপুত্র বরবেশে মন্ত্রীপুত্রের সঙ্গে রাজবাড়ির খিড়কির দরজায় হাজির হলো। মন্ত্রীপুত্রকে বাইরে রেখে সে অন্দরমহলে ঢুকল। রাজকুমারীও বধূবেশে রাজপুত্রের প্রতীক্ষায় বসে ছিল।

রাজকুমারীর সখিদের সামনে মালাবদল করে দুজনের গান্ধর্বমতে বিয়ে হলো। রাজকুমারী রাজপুত্রকে আর ছাড়ল না, নিজের ঘরেই রেখে দিল। তখন থেকে মহাসুখে দুজনের দিন কাটতে লাগল।

কিছুদিন যায়। একদিন রাজকুমার রাজকুমারীকে বলল, সে দেশে ফিরতে চায়। অনেকদিন দেশছাড়া, প্রিয় বন্ধু মন্ত্রীপুত্রকেও দেখে না, মন খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু রাজকুমারী কিছুতেই তাকে যেতে দিল না।

তারপর আরও একমাস কেটে গেল। বন্দি থাকতে থাকতে রাজপুত্রের মন আরও খারাপ হলো। একদিন একা বসে বসে ভাবছে; আমি নিতান্ত নরাধম, না হলে নিজের সুখের জন্য পিতা-মাতা, জন্মভূমি সব ছাড়ে কেউ? মন্ত্রীপুত্রের মতো প্রিয় বন্ধুরও খবর নিতে পারি না। নিশ্চয়ই সে আমাকে স্বার্থপর ও অকৃতজ্ঞ ভাবছে!

এমন সময় রাজকুমারী সেখানে এসে উপস্থিত হলো। রাজকুমারকে বিষণ্ন দেখে জিজ্ঞেস করল, এত মন খারাপ করে কী ভাবছ? তোমার মুখ কালো দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়। তোমার কী হয়েছে বলো।

রাজকুমার বলল, তোমাকে তো বলেছি, অনেকদিন হলো আমার প্রিয় বন্ধুর কোনও খবর পাই না। সে-ই তোমার আমার মিলন ঘটিয়ে দিয়েছে। জানি না সে এখন কোথায়, কেমন আছে?

রাজকুমারী বুঝল, মন্ত্রীপুত্রের বুদ্ধিতেই রাজকুমার ওর কাছে আসতে পেরেছে। বলল, প্রিয় বন্ধুকে না দেখলে কষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। এতদিন তার খবর না নেয়াটা খুব অন্যায় হয়েছে। তাকে খুশি করতে আমি নিজহাতে মিষ্টি বানিয়ে পাঠাব। তুমিও এখন কিছুক্ষণের জন্য তাকে গিয়ে দেখে এসো।

রাজকুমার খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে বৃদ্ধার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলো। অনেকদিন পরে বন্ধুর দেখা পেয়ে তার আনন্দের সীমা রইল না। দুজনে অনেক কথা হলো।

এদিকে রাজপুত্রকে বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে রাজকুমারী ভাবল, রাজকুমার নিশ্চয়ই বন্ধুর কাছে তাদের গোপন বিয়ের কথা বলবে। মন্ত্রীপুত্র তার অন্য বন্ধুদের বলবে। একান ওকান হতে হতে শেষে আমার বাবা-মা'র কানেও উঠবে। শুনে তারা আমার ওপর রাগ করবে। অতএব মন্ত্রীপুত্রকে জীবিত রাখা উচিত হবে না।

রাজকুমারী তখন নানারকম খাবার বানিয়ে তাতে বিষ মিশিয়ে তার এক সখিকে দিয়ে বৃদ্ধার বাড়িতে পাঠিয়ে দিল।

রাজপুত্র বলল, বন্ধু! আমার স্ত্রী নিজের হাতে তোমার জন্য খাবার বানিয়ে পাঠিয়েছে। আমার সামনে বসে তুমি খাও; আমি খুব খুশি হব। তাকে গিয়ে বলতে পারব, তুমি খাবার খেয়ে খুব প্রশংসা করেছ।

মন্ত্রীপুত্র কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বন্ধু! তুমি কিছু মনে কোরো না, ওই খাবার আমি খেতে পারব না। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমি মারা যাব। তোমার স্ত্রী আমার জন্য বিষ মেশানো খাবার পাঠিয়েছে।

রাজকুমার বলল, বন্ধু! তুমি কী বলছ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি তাকে দেখনি, চেনো না, সে-জন্য এমন কথা বলছ। তার নামে এমন দোষ দেওয়া খুব অন্যায়। যা হোক, তোমার সামনেই আমি সন্দেহ দূর করছি। বলে একটা নাড়ু নিয়ে বিড়ালকে খেতে দিল। বিড়ালটি নাড়ু খেয়ে মরে গেল। দেখে রাজপুত্র ভীষণ রেগে গিয়ে বলল, এমন পাপিষ্ঠার মুখ দেখাও পাপ। জীবনে আমি আর তার মুখ দেখব না।

মন্ত্রীপুত্র বলল, না, বন্ধু! একেবারে ত্যাগ করা উচিত হবে না, কৌশলে তাকে আমাদের রাজধানীতে নিয়ে যেতে হবে।

রাজকুমার বলল, তুমি যা বলবে, আমি তাই করব।

মন্ত্রীপুত্র বলল, এক কাজ করো। তুমি তোমার স্ত্রীর কাছে যাও। তাকে বলো, মন্ত্রীপুত্র তোমার তৈরি খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি তোমাকে না দেখে বেশিক্ষণ থাকতে পারি না; তাই তার ঘুম ভাঙার অপেক্ষা না করেই চলে এসেছি। তারপর রাতে তোমার স্ত্রী যখন ঘুমাবে, তখন তার গা থেকে সব অলংকার খুলে নিয়ে, তার বাঁ-পায়ে ত্রিশূলের চিহ্ন এঁকে দিয়ে আমার কাছে চলে আসবে।

বন্ধুর কথায় রাজি হয়ে রাজকুমার রাজবাড়িতে ফিরে গেল। রাতে রাজকুমারী ঘুমালে বন্ধুর পরামর্শমত সব কাজ শেষ করে, বৃদ্ধার বাড়িতে ফিরে এল।

পরদিন সকালে মন্ত্রীপুত্র এক শ্মশানে গিয়ে যোগী সাজল, রাজপুত্রকে সাজাল তার শিষ্য; তারপর বলল, তুমি এই অলংকারগুলো বিক্রি করতে নিয়ে যাও। কেউ তোমাকে চোর সন্দেহ করলে, তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে।

রাজপুত্র বন্ধুর কথামত অলংকার বিক্রি করতে এক স্বর্ণকারের দোকানে ঢুকল। স্বর্ণকার অলংকার দেখে অবাক। কিছুদিন আগে সে-ই রাজকুমারীকে এগুলো বানিয়ে দিয়েছিল। তার সন্দেহ হলো, এই বিদেশি লোকটি অলংকারগুলো চুরি করেছে।

সে রাজপুত্রকে জিজ্ঞেস করল, এ-সব গহনা তুমি কোথায় পেলে? এগুলো রাজকুমারীর গহনা। নিশ্চয় তুমি চুরি করেছ।

রাজকুমার বলল, চুরি করিনি। আমার গুরু আমাকে বিক্রি করতে দিয়েছেন।

এক কথা দু কথায় প্রচণ্ড ঝগড়া শুরু হলো। স্বর্ণকারের দোকানের সামনে ভিড় জমে গেল। শেষে নগরপালের কাছে খবর পৌঁছল। সে এসে রাজপুত্রকে জিজ্ঞেস করল, এই অলংকার তুমি কোথায় পেলে?

রাজপুত্র বলল, আমার গুরুদেব শ্মশানে বাস করেন। তিনিই আমাকে গহনাগুলো বিক্রি করতে পাঠিয়েছেন। তিনি কোথায় পেয়েছেন, আমি জানি না।

রাজপুত্রের কথা শুনে নগরপাল শ্মশানে গিয়ে মন্ত্রীপুত্রকেও ধরল। তারপর সমস্ত অলংকার ও স্বর্ণকারকেসহ রাজপুত্র-মন্ত্রীপুত্র দুজনকে নিয়ে রাজার কাছে হাজির হলো।

নগরপালের কাছে সব কথা শুনে রাজার মনে সন্দেহ দেখা দিল। রাজা যোগীরূপী মন্ত্রীপুত্রকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, প্রভু, এ-সব অলংকার আপনি কোথায় পেলেন?

মন্ত্রীপুত্র বলল, মহারাজ! গত কৃষ্ণচতুর্দশী রাতে আমি নগরের শেষে শ্মশানে ডাকিনীমন্ত্র সাধন করছিলাম। আমার মন্ত্রের বলে ডাকিনী এসে সিদ্ধিলাভের ফলস্বরূপ তার এই অলংকারগুলো আমাকে দিয়ে গেছে। আমিও তার বাঁ পায়ে ত্রিশূলের চিহ্ন এঁকে দিয়েছি।

যোগীর কথায় রাজার সন্দেহ আরও বাড়ল। তিনি অন্দরমহলে গিয়ে রানীকে জিজ্ঞেস করলেন, দেখো তো, পদ্মাবতীর বাঁ পায়ে কোনও চিহ্ন আছে কি না?

রানী দেখে এসে বলল, হ্যাঁ, একটা ত্রিশূলের চিহ্ন আছে।

রানীর কথা শুনে রাজা লজ্জায় মাথা হেঁট করে ভাবতে লাগলেন, আমি যা ভেবেছিলাম তাই হলো। এমন ডাকিনী মেয়েকে বাড়িতে রাখা উচিত নয়। এতে অধর্ম হবে। কিন্তু কী করা যায়? পণ্ডিতদের কাছে পরামর্শ নিতে গেলে ঘরের কথা প্রকাশ হয়ে পড়বে। তারচেয়ে বরং ওই যোগীকেই জিজ্ঞেস করা যাক। তিনি তো সবই জানেন। তাঁর কাছে আর নতুন কিছু প্রকাশ হওয়ার ভয় নেই।

রাজা তখন মন্ত্রীপুত্রের পরামর্শ চাইলেন। মন্ত্রীপুত্র বলল, মহারাজ। শাস্ত্রে আছে স্ত্রীলোক গুরুতর অপরাধ করলেও তাকে হত্যা করতে নেই। তবে রাজা তাকে নির্বাসন-দণ্ড দিতে পারে।

মন্ত্রীপুত্রের কথামত রানীর কাছে গিয়ে রাজা সব বলে, তাকে অনেক বুঝিয়ে, তার সম্মতি নিয়ে, রাজকুমারীকে নির্বাসন-দণ্ড দিলেন। রাজার আদেশমত বাহকরা পদ্মাবতীকে পালকিতে চড়িয়ে এক গভীর বনে রেখে এল।

ওদিকে মন্ত্রীপুত্রও রাজপুত্রকে নিয়ে গোপনে তাদের অনুসরণ করল। রাজার লোকেরা চলে গেলে পদ্মাবতীর কাছে গিয়ে দেখে সে গাছের তলায়

একা বসে কাঁদছে। দুই বন্ধু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে নিজেদের রাজধানীতে নিয়ে এল। প্রজারা তাদের দেখে খুশি হলো। রাজা প্রতাপমুকুট পুত্র ও পুত্রবধূর মুখ দেখে খুশি হয়ে তাদের আশীর্বাদ করলেন। তাঁর আদেশে নগরে মহোৎসব আরম্ভ হলো।

গল্প শেষ করে বেতাল জিজ্ঞেস করল, মহারাজ! রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র ও রাজা দন্তবাট—এই তিনজনের মধ্যে রাজকন্যার নির্বাসনের জন্য কে বেশি দায়ী?

বিক্রমাদিত্য বললেন, রাজা দন্তবাট।

বেতাল জিজ্ঞেস করল, কেন? শাস্ত্রে আছে, শত্রুকে হত্যা করলে পাপ হয় না। মন্ত্রীপুত্রকে শত্রু ভেবে তাকে হত্যা করতে রাজকুমারী খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। কাজেই রাজকুমারীকে দোষী বলব না। কিন্তু রাজা একজন অজানা অচেনা লোকের কথায় বিশ্বাস করে, কোনরকম খোঁজ-খবর না নিয়ে; মেয়ের প্রতি স্নেহ-মমতা সব ভুলে তাকে নির্বাসন-দণ্ড দিলেন, তাতে রাজধর্মের বিরুদ্ধে কাজ করা হয়েছে। ফলে তাকেই দায়ী করতে হয়।

এ-কথা শুনে বেতাল শ্মশানে ফিরে গিয়ে আবার শিরীষগাছে ঝুলতে লাগল। রাজাও তাকে গাছ থেকে নামিয়ে আগের মতো কাঁধে করে সন্ন্যাসীর কাছে চললেন।

দ্বিতীয় গল্প

বেতাল বলল, মহারাজ, দ্বিতীয় গল্প শুনুন। যমুনাতীরে জয়স্থল নামে এক নগরে কেশব নামে খুব ধার্মিক এক ব্রাহ্মণ ছিল। তার পরমা সুন্দরী একটি মেয়ে ছিল। মেয়েটির নাম মধুমালতী। মেয়ের বিয়ের বয়স হলে ব্রাহ্মণ ও তার পুত্র মেয়েটির জন্য পাত্র খুঁজতে লাগল।

কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণের এক যজমানের ছেলের বিয়ের জন্য ব্রাহ্মণকে অন্য গ্রামে যেতে হলো। ব্রাহ্মণের ছেলেও লেখাপড়া করার জন্য গুরুঘরে চলে গেল। এই সময়ে ত্রিবিক্রম নামে এক ব্রাহ্মণের ছেলে এসে তাদের বাড়িতে অতিথি হলো। ত্রিবিক্রমের যেমন বিদ্যাবুদ্ধি তেমনি রূপ। তাকে দেখে কেশবের স্ত্রী ভাবল, আহা! ছেলেটি বেশ। এ যদি ভাল বংশে জন্মে থাকে, আর আমার মধুমালতীকে বিয়ে করতে রাজি হয়, তাহলে একেই আমার জামাই করব।

খুব আদরযত্নের সাথে ত্রিবিক্রমকে খাওয়ানোর পর ব্রাহ্মণী তাকে ঘরের কথা জিজ্ঞেস করে জানল, সে সৎবংশের ছেলে। তখন ব্রাহ্মণী খুশি হয়ে

বলল, তুমি রাজি থাকলে তোমার সঙ্গে আমার মেয়ে মধুমালতীর বিয়ে দিতে চাই।

ত্রিবিক্রম মধুমালতীর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। ব্রাহ্মণীর প্রস্তাবে রাজি হয়ে ব্রাহ্মণের অপেক্ষায় সেখানেই থেকে গেল।

কিছুদিন পরে কেশব ও তার পুত্র, মধুমালতীর জন্য একজন করে বর নিয়ে বাড়ি ফিরল। মধুমালতীর জন্য পাত্র এখন তিনজন। প্রথমজনের নাম ত্রিবিক্রম, দ্বিতীয়জনের নাম বামন, তৃতীয়জনের নাম মধুসূদন। তিনজনেই রূপেগুণে সমান। কেশব মহা দুর্ভাবনায় পড়ল। তিন পাত্রকেই মধুমালতীকে বিয়ে দেয়া হবে বলে কথা দেয়া হয়েছে। এখন কার হাতে মধুমালতীকে দান করা যায়?

ব্রাহ্মণ বসে বসে ভাবছে, এমন সময় ব্রাহ্মণী এসে কেঁদে বলল, তুমি এখানে বসে আছো, ওদিকে যে মধুমালতীকে সাপে কামড়েছে।

ব্রাহ্মণ মহাব্যস্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ চার-পাঁচজন বিষ-বৈদ্য এনে মধুমালতীর চিকিৎসা করাল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। বৈদ্যরা বলল, একে বাঁচানো যাবে না।

মধুমালতীর মৃত্যু হলো। তখন পিতা, পুত্র ও তিন পাত্র মিলে মধুমালতীর দেহ শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দাহ করল।

তারপর মনের দুঃখে তিন পাত্রই বিবাগী হলো। ত্রিবিক্রম চিতা থেকে মধুমালতীর হাড় নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বামন তীর্থযাত্রা করল; আর, মধুসূদন সেই শ্মশানের একধারে কুঁড়েঘর বেঁধে তাতে মধুমালতীর ভস্ম রেখে যোগসাধনা করতে লাগল।

একদিন দুপুরে বামন ঘুরতে ঘুরতে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত। খাওয়ার সময় অতিথি দেখে ব্রাহ্মণ হাতজোড় করে বলল, বাবা, গরিবের বাড়িতে যখন পায়ের ধুলো দিয়েছ, দয়া করে আমার সঙ্গে বসে খাও। রান্না প্রায় হয়ে এল।

ব্রাহ্মণের কথায় রাজি হয়ে বামন খেতে বসল। ব্রাহ্মণী পরিবেশন করতে লাগল। এমন সময় ব্রাহ্মণের পাঁচ বছরের ছেলেটি সেখানে এসে উৎপাত শুরু করল। ব্রাহ্মণী ছেলেটিকে নানাভাবে শান্ত করার চেষ্টা করল, কিন্তু ছেলেটি শান্ত হলো না। তখন ব্রাহ্মণী রেগে তাকে জ্বলন্ত উনানের মধ্যে ফেলে দিয়ে, নিশ্চিন্ত মনে পরিবেশন করতে লাগল।

এমন ভয়ংকর ব্যাপার দেখে বামন আর খেতে পারল না। হতভম্বের মতো বসে রইল। দেখে ব্রাহ্মণ বলল, বাবা, তুমি হঠাৎ খাওয়া বন্ধ করলে কেন?

বামন বলল, এ-সব দেখে কার আর খাওয়ার রুচি থাকে?

ব্রাহ্মণ হেসে তখনই ঘর থেকে সঞ্জীবনী-বিদ্যার বই এনে সেটা থেকে দেখে একটা মন্ত্র জপ করতে লাগল। ব্রাহ্মণের ছেলেটি বেঁচে উঠে আবার উৎপাত শুরু করল।

ব্রাহ্মণের কাণ্ড দেখে বামন অবাক। সে ভাবল, এই বইয়ে সঞ্জীবনী-মন্ত্র আছে। মন্ত্রটা জানতে পারলে মধুমালতীকে বাঁচাতে পারব। তাই যেমন করেই হোক, বইটি নিয়ে যেতে হবে।

বামন ব্রাহ্মণকে বলল, মহাশয়! বেলা পড়ে এল। আপনাদের অসুবিধে না হলে রাতে অন্য কোথাও না গিয়ে এ বাড়িতেই থাকি।

ব্রাহ্মণ খুব আদর করে অতিথির থাকবার জায়গা করে দিল। খেয়েদেয়ে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ঘুমিয়ে পড়লে গভীর রাতে বামন চুপি চুপি ঘরে ঢুকে সঞ্জীবনী-বিদ্যার বইটা নিয়ে চলে গেল।

কিছুদিন পরে জয়স্থলের সেই শ্মশানে উপস্থিত হয়ে বামন দেখল, মধুসূদন কুটিরে বসে যোগসাধনা করছে। এই সময় ত্রিবিক্রমও সেখানে হাজির হলো। বামন বলল, আমি সঞ্জীবনী-বিদ্যা শিখেছি। তোমরা মধুমালতীর হাড় ও ভস্ম একত্র করো, আমি তাকে বাঁচাব।

ত্রিবিক্রম ও মধুসূদন মধুমালতীর হাড় ও ভস্ম একত্র করল। বামন সঞ্জীবনী মন্ত্র পড়তে লাগল। মধুমালতী বেঁচে উঠল। তখন তিনজনে মধুমালতীকে বিয়ে করার জন্য ঝগড়া শুরু করল।

গল্প শেষ করে বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞেস করল, মহারাজ! ওই তিনজনের মধ্যে মধুমালতীকে বিয়ে করার উপযুক্ত কে?

রাজা বললেন, আমার মতে মধুসূদন।

বেতাল প্রশ্ন করল, কেন? ত্রিবিক্রম যদি মধুমালতীর হাড় না রাখত আর বামন যদি সঞ্জীবনী-বিদ্যার বই না আনত, তাহলে মধুমালতীকে বাঁচাত কীভাবে?

রাজা বললেন, তুমি যা বলছ, তা ঠিক। কিন্তু পুত্রই বাবা-মা'র হাড় সঞ্চয় করে; সুতরাং ত্রিবিক্রম মধুমালতীর ছেলের মতো হয়ে গেছে। বামন তার জীবন দান করে তার বাপের জায়গা নিয়েছে। কাজেই তারা মধুমালতীকে বিয়ে করতে পারে না। মধুসূদন ভস্ম নিয়ে শ্মশানে বাস করে তাকে বিয়ে করার দাবিদার হয়েছে।

এ-কথা শুনে বেতাল ইত্যাদি।

তৃতীয় গল্প

বেতাল বলল, মহারাজ, বর্ধমান নগরে রূপসেন নামে একজন বিদ্বান, ধার্মিক ও দানশীল রাজা ছিলেন। একদিন বীরবর নামে একজন রাজপুত তার কাছে চাকরির জন্য এল। দারোয়ান তার কথা রাজার কাছে গিয়ে বললে, রাজা বললেন, তাকে এখনই আমার কাছে নিয়ে এসো।

দারোয়ান বীরবরকে রাজার কাছে নিয়ে এল। রাজা দেখেই বুঝলেন, লোকটি কাজের। বীরবরকে জিজ্ঞেস করলেন, কত টাকা মাইনে চাও?

বীরবর বলল, মহারাজ! প্রতিদিন এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পরিবারে কতজন লোক?

বীরবর বলল, এক স্ত্রী, এক পুত্র, এক মেয়ে, আর আমি; এই চারজন।

বীরবরের কথা শুনে রাজা ভাবলেন, পরিবারে মাত্র চারজন লোক, তবু এত টাকা বেতন চায় যখন, নিশ্চয় লোকটির কোনও অসাধারণ গুণ আছে। কিছুদিন চাকরিতে রেখে এর গুণ ও ক্ষমতা পরীক্ষা করা দরকার। রাজা বীরবরকে চাকরি দিলেন।

বীরবর তার প্রথম বেতনের অর্ধেক ব্রাহ্মণকে দান করল। বাকি অর্ধেকের অর্ধেক সাধু-সন্ন্যাসীকে দিল। তারপর যা রইল, সেটা দিয়ে খাবার কিনে রান্না করে বেশিরভাগটাই গরিব-দুঃখীকে খাওয়াল। অবশিষ্ট অতি সামান্য খাবার যা বেঁচে রইল সেটা ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে ভাগ করে খেল।

বীরবর তার প্রতিদিনের বেতন এভাবে দান করে দিয়ে অস্ত্রহাতে রাজবাড়ির দরজায় সারারাত পাহারা দেয়। রাজা তার শক্তি ও প্রভুভক্তি পরীক্ষার জন্য যখন যে আদেশ দেন, অতি কঠিন হলেও বীরবর তা পালন করে।

একদিন গভীর রাতে হঠাৎ মেয়েমানুষের কান্না শুনে রাজা বীরবরকে ডেকে বললেন, দক্ষিণ দিকে কান্না শুনতে পাচ্ছ? এর কারণ জেনে এসে আমাকে বলো।

বীরবর সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলো। রাজাও কৌতূহলী হয়ে গোপনে বীরবরের পিছন পিছন চললেন।

কান্নার শব্দ শুনে চলতে চলতে বীরবর এক ভয়ংকর শ্মশানে উপস্থিত হলো; দেখল, এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে কপাল চাপড়ে বিলাপ করে কাঁদছে। বীরবরের খুব অবাক লাগল। সে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, মা, তুমি কে? এত রাতে একা একা শ্মশানে বসে কাঁদছ কেন?

মেয়েটি কথার জবাব না দিয়ে আরও জোরে কেঁদে উঠল।

কিন্তু বীরবরও নাছোড়। সে জানার জন্য চাপাচাপি করতেই থাকল। শেষে মেয়েটি বলল, আমি রাজলক্ষ্মী। রাজা রূপসেনের বাড়িতে অনেক অন্যায়-অত্যাচার হচ্ছে। সেজন্য রাজবাড়িতে শীঘ্রই অলক্ষ্মী ঢুকবে। অলক্ষ্মী ঢুকলে আমাকে চলে যেতে হবে। আর আমি চলে গেলে, অল্পদিনের মধ্যেই রাজার মৃত্যু ঘটবে। সেই দুঃখে আমি কাঁদছি।

প্রভুর অমঙ্গলের কথা শুনে বীরবর দুঃখিত হয়ে বলল, মা, আপনি দেবী; দেবীর কথায় তো আর সন্দেহ করতে পারি না। অমঙ্গল থেকে যদি রাজাকে বাঁচাবার কোনও উপায় থাকে তো বলুন। আমি রাজার জন্য প্রাণ দিতেও রাজি।

দেবী রাজলক্ষ্মী বলল, পূর্বদিকে অর্ধযোজন দূরে আরেক দেবী আছেন। যদি কেউ ওই দেবীর কাছে নিজের ছেলেকে নিজের হাতে বলি দেয়, তবে দেবী সন্তুষ্ট হয়ে রাজার অমঙ্গল দূর করতে পারেন।

রাজলক্ষ্মীর কথা শুনে বীরবর তখনই তার বাড়ির দিকে ছুটল। বাড়ি পৌঁছে স্ত্রীকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে সব কথা জানাল। স্ত্রী তখন ছেলের ঘুম ভাঙিয়ে বলল, বাবা, দেবীর কাছে তোমাকে বলি দিলে রাজা দীর্ঘজীবন লাভ করে অনেকদিন রাজত্ব করতে পারবেন। এখন তুমি বলো, তুমি কী করবে।

ছেলে বলল, মা, একদিন তো মরতেই হবে। এখন মরে যদি জীবনটা দেবসেবায় লাগাতে পারি আর তাতে যদি রাজার মঙ্গল হয়, তবে তা-ই করা উচিত। এমন শুভকর্মে আপনারা দেরি করবেন না, শীঘ্র যা করার করুন।

বীরবর ছেলের কথা শুনে অবাকও হলো, খুশিও হলো। সে সজল চোখে তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি খুশি হয়ে তোমার ছেলেকে দান করো, তবেই আমি তাকে বলি দিয়ে রাজার উপকার করতে পারি।

স্ত্রী খুশি হয়ে মত দিলে, বীরবর তাদের সবাইকে নিয়ে দেবীর মন্দিরে চলল। বীরবর ও তার পরিবারের প্রভুভক্তি দেখে রাজা খুব খুশি হলেন। তারা কী করে দেখার জন্য গোপনে তাদের পিছন পিছন চললেন।

কিছুক্ষণ পর সবাই দেবীর মন্দিরে পৌঁছল। বীরবর প্রথমে দেবীর পূজা করে করজোড়ে দেবীকে বলল, জগদীশ্বরি! তোমাকে সন্তুষ্ট করতে নিজের হাতে আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় পুত্রকে বলি দিচ্ছি। মা! দয়া করো, যেন আমার প্রভুর জীবন দীর্ঘ হয়।

এই বলে বীরবর খড়্গ দিয়ে পুত্রের মাথা কেটে ফেলল। বীরবরের মেয়ে প্রিয় ভাইয়ের ভয়ানক মৃত্যু দেখে শোকে-দুঃখে সেই খড়্গ দিয়ে নিজের মাথা কাটল। বীরবরের স্ত্রী-ও দুই সন্তানের মৃত্যুতে পাগল হয়ে খড়্গ দিয়ে মাথা কেটে মারা গেল। তখন বীরবর ভাবল, প্রভুর কাজ শেষ করলাম;

এখন পুরো পরিবারকে হারিয়ে কী সুখে আর বেঁচে থাকি? এই ভেবে সে-ও সেই খড়গ দিয়ে নিজের মাথা কেটে ফেলল।

অল্পক্ষণের মধ্যে এমন ভয়ংকর কাণ্ড দেখে রাজার মনে বৈরাগ্য জন্মাল। রাজা ভাবলেন, যে রাজ্যের জন্য এমন প্রভুভক্ত ভৃত্যের সর্বনাশ হলো, সে রাজ্যভোগে আমার আর আগ্রহ নেই। আমি নিতান্ত স্বার্থপর ও অবিবেচক না হলে কেন বীরবরকে পুত্রহত্যায় বাধা দিলাম না? কেনই-বা তাকে আত্মহত্যা করতে দিলাম? বীরবরকে এমন ভয়ংকর কাজ থেকে বিরত রাখা আমার উচিত ছিল। আমি খুবই খারাপ কাজ করেছি। এখন আত্মহত্যা করে এর প্রায়শ্চিত্ত করব।

এই ভেবে রাজা সেই খড়গ দিয়ে নিজের মাথা কাটার উপক্রম করতেই দেবী রাজার হাত ধরে তাকে নিরস্ত করল এবং বলল, বৎস! আমি তোমার সাহস ও শুভ বুদ্ধি দেখে খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি বর চাও!

রাজা বললেন, মা যদি সন্তুষ্ট হয়ে থাকো, তাহলে এই চারজনের জীবন দান করো!

দেবী তথাস্তু বলে তৎক্ষণাৎ চারজনকে বাঁচিয়ে দিল। এতে রাজার আনন্দের সীমা রইল না। রাজা সাষ্টাঙ্গে দেবীকে প্রণাম করে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে তার স্তব করতে লাগলেন। দেবী সন্তুষ্ট হয়ে রাজাকে আরও বর দিয়ে অদৃশ্য হলো।

পরদিন সকালে রাজা রূপসেন সভায় সিংহাসনে বসে সবার সামনে বীরবরকে অর্ধেক রাজত্ব দান করলেন।

গল্প শেষ করে বেতাল জিজ্ঞেস করল, মহারাজ! বলুন দেখি, এই ব্যাপারে কার মহত্ত্ব বেশি?

বিক্রমাদিত্য বললেন, আমার মতে রাজা রূপসেনের। কেন? প্রভুর জন্য ভৃত্য ত্যাগ স্বীকার করতেই পারে। বীরবর তার কর্তব্য করেছে। কিন্তু রাজা যে ভৃত্যের জন্য নিজের প্রাণ দিতে উদ্যত হলেন, এমন মহত্ত্ব কখনও শুনি নি।

এ-কথা শুনে বেতাল ইত্যাদি।

চতুর্থ গল্প

বেতাল বলল, মহারাজ! ভোগবতী নগরে অনঙ্গসেন নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁর একটা শুকপাখি ছিল। নাম চূড়ামণি। পাখিটিকে রাজা খুব ভালবাসতেন, সব সময় কাছে রাখতেন। একদিন রাজা কথায় কথায় পাখিটিকে জিজ্ঞেস করলেন, পাখি, তুমি কী কী বিষয় জানো?

শুক বলল, মহারাজ! আমি ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব জানি।

রাজা বললেন, তাহলে বলো দেখি, আমি বিয়ে করতে পারি এমন মেয়ে কোথায় আছে?

চূড়ামণি বলল, মহারাজ! মগধ দেশের রাজা বীরসেনের চন্দ্রাবতী নামে এক মেয়ে আছে, তার সাথে আপনার বিয়ে হবে। মেয়েটি অপরূপ সুন্দরী ও অতি গুণবতী।

রাজা শুকের কথা পরীক্ষা করার জন্য বিখ্যাত গণক চন্দ্রকান্তকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন, বলুন দেখি, কোন মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে?

গণক গণনায় জেনে বলল, মহারাজ! চন্দ্রাবতী নামে এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যা আপনার রানী হবেন।

শুনে রাজা শুকের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। পরে একজন চতুর ঘটককে মগধের রাজার কাছে পাঠালেন। চন্দ্রাবতীর কাছেও মদনমঞ্জরী নামে এক শারি ছিল। সে-ও শুকের মতো তিনকালের খবর জানত। একদিন রাজকন্যা তাকে জিজ্ঞেস করল, শারি! যদি তিনকালের খবরই তোমার জানা থাকে তাহলে বলো তো কার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে?

শারি বলল, রাজকুমারী; ভোগবতী নগরের রাজা অনঙ্গসেনের সাথে আপনার বিয়ে হবে?

কিছুদিনের মধ্যে ঘটক মগধে গিয়ে অনঙ্গসেনের সাথে চন্দ্রাবতীর বিয়ের প্রস্তাব করলে রাজা তাতে সম্মত হলেন। কালবিলম্ব না করে ঘটক এই খবর নিয়ে মগধে ফিরে গেল। তারপর নির্দিষ্ট দিনে অনঙ্গসেন ও চন্দ্রাবতীর বিয়ে হলো। রাজধানীতে ফিরে অনঙ্গসেন চন্দ্রাবতীকে নিয়ে পরম সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

স্বামীগৃহে আসার সময় চন্দ্রাবতী তার শারিটিকেও সঙ্গে এনেছিল। একদিন রাজা-রানী অন্দরমহলে বসে গল্প করছেন। শুক-শারি তাদের কাছেই আছে। রাজা রানীকে বললেন, দেখো, একা থাকা বড় কষ্ট। তাই আমার ইচ্ছে শুক-শারির বিয়ে দিয়ে দুটিকে এক খাঁচায় রেখে দিই। রানী একটু হেসে সম্মতি দিলে, রাজা শুকের সঙ্গে শারির বিয়ে দিয়ে দুজনকে এক খাঁচায় রেখে দিলেন।

দিন যায়। একদিন রাজা-রানী আমোদ-প্রমোদে রত, এমন সময় শুক-শারির ঝগড়া বেধে গেল। শারি বলছে, পুরুষরা ভীষণ স্বার্থপর, ধূর্ত ও অধার্মিক।

শুকও কম যায় না, বলল, মেয়েরাও চঞ্চল, মিথ্যেবাদী, আর কুটিল।

রাজা তাদের ঝগড়া শুনে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা মিছামিছি ঝগড়া করছ কেন?

শারি বলল, মহারাজ! পুরুষজাত বড় অধার্মিক। তাই তাদের ওপর আমার কোনরকম শ্রদ্ধা-ভক্তি নেই, আকর্ষণও নেই। পুরুষের ব্যবহার ও চরিত্র সম্বন্ধে একটা গল্প বলছি, শুনুন, তাহলেই বুঝবেন কেন আমার এই রাগ : ইলাপুরে মাহধন নামে এক ধনী বণিক ছিল। অনেক দিন কেটে গেল, তবু তার ছেলে হলো না, এজন্য তার মনে খুব দুঃখ ছিল। অবশেষে ভগবানের কৃপায় তার একটা ছেলে হলো। বণিক তার নাম রাখল নয়নানন্দ। নয়নানন্দের পাঁচ বছর বয়েসে বাবা তার লেখাপড়া শেখার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করল। কিন্তু ছেলেটি অসৎসঙ্গে মিশে খারাপ কাজে সময় নষ্ট করতে লাগল, পড়াশোনায় একটুও মন দিল না। বয়স যতই বাড়ল, তার চরিত্রও তত খারাপ হতে লাগল।

কিছুদিন পরে বণিক মারা গেল। নয়নানন্দ পাশা খেলে, মদ খেয়ে, অসৎ বন্ধুদের সঙ্গে মিশে অল্প সময়ের মধ্যেই বাবার সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করে ফেলল। তারপর তার কষ্টের সীমা রইল না। তখন সে ইলাপুর ছেড়ে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে চন্দ্রপুরের বণিক হেমগুপ্তের বাড়ি গিয়ে উঠল। হেমগুপ্ত তার পিতার পরম বন্ধু ছিল। নয়নানন্দ তার কাছে নিজের পরিচয় দিল। খুব খুশি হয়ে হেমগুপ্ত জিজ্ঞেস করল, বাবা, তুমি হঠাৎ কোথা থেকে এখানে এলে?

নয়নানন্দ বলল, আমি জাহাজে চড়ে সিংহলে বাণিজ্য করতে যাচ্ছিলাম। পথে প্রবল ঝড়ে সবগুলো জাহাজ ডুবে যায়। ভাগ্য ভাল, আমি একটা কাঠ ধরে ভেসে থেকে প্রাণ বাঁচাতে পেরেছি। আমার লোকজন কে কোথায় গেছে জানি না। জিনিসপত্র সবই ডুবে গেছে। এই ভিখিরির বেশে দেশে ফিরতে লজ্জা করছিল, আর কোনও উপায় না দেখে আপনার কাছে এসেছি।

নয়নানন্দের কথা শুনে হেমগুপ্ত ভাবল, আমি বহুদিন ধরে রত্নাবতীর জন্য পাত্র খুঁজছি; কিন্তু কোথাও তার বর পাচ্ছি না। ভগবান দয়া করে একে এনে দিলেন। এর পিতা অনেক সম্পত্তি রেখে গেছে। ছেলেটির বংশও ভাল। এ হয়তো এর পিতার সদ্‌গুণগুলোও পেয়েছে। অতএব শীঘ্র দিন ঠিক করে এর সাথে রত্নাবতীর বিয়ে দিয়ে দিই। এই ভেবে সে তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে সব কথা জানিয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমার মত কী?

স্ত্রী বলল, ভগবানের ইচ্ছে না হলে এমন ঘটে না। তুমি যত তাড়াতাড়ি পারো, দুজনের বিয়ের ব্যবস্থা করো।

তারপর শুভদিন শুভলগ্নে নয়নানন্দের সঙ্গে রত্নাবতীর বিয়ে হয়ে গেল।

কিছুদিন যায়। দুজনে পরম সুখে দিন কাটাচ্ছে।

একদিন নয়নানন্দের মনে দুষ্টবুদ্ধির উদয় হলো। সে তার স্ত্রীকে বলল, দেখো, অনেক দিন আমি দেশছাড়া। দেশের জন্য মন কেমন করছে।

সুতরাং তোমার বাবা-মাকে রাজি করিয়ে আমাকে বিদায় দাও। আর, ইচ্ছে হলে তুমিও আমার সঙ্গে যেতে পারো।

রত্নাবতী তার বাবা-মা'র কাছে গিয়ে স্বামীর ইচ্ছের কথা জানালে তারা সম্মত হলো। রত্নাবতীও স্বামীকে এসে বলল, বাবা-মা রাজি হয়েছে। কিন্তু তুমি আমাকে ফেলে যেয়ো না। তোমাকে ছেড়ে আমি কিছুতেই থাকতে পারব না।

তারপর বণিক হেমগুপ্ত নয়নানন্দকে অনেক জিনিসপত্র ও ধনরত্ন দিয়ে বিদায় দিল। রত্নাবতীকেও অনেক মূল্যবান গহনায় সাজিয়ে দিল। নয়নানন্দ মহানন্দে স্বদেশে যাত্রা করল।

চলতে চলতে দুজনে এক গভীর বনে এসে পড়লে নয়নানন্দ স্ত্রীকে বলল, দেখো, এই বনে ডাকাতের ভয় আছে। গহনা পরে যাওয়া নিরাপদ নয়। তুমি গহনাগুলো খুলে আমার কাছে দাও; আমি কাপড়ে বেঁধে রাখি। বন থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার পরে নিও। আর, পালকিরও দরকার নেই। বেহারারা পালকি নিয়ে ফিরে যাক। আমরা দুজনে ভিখিরির বেশে হেঁটে যাব। তাহলে নিরাপদে যেতে পারব।

রত্নাবতী সমস্ত গহনা খুলে স্বামীর হাতে দিল। দাসদাসী ও পালকিসহ বেহারাদের বিদায় করে দিয়ে সেই দুষ্টের সঙ্গে হেঁটে চলল। নয়নানন্দ রত্নাবতীকে নিয়ে ক্রমে আরও গভীর বনে উপস্থিত হলো, তারপর তাকে একটা কুয়ার মধ্যে ফেলে দিয়ে চলে গেল।

রত্নাবতী চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। এক পথিক সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় রত্নাবতীর কান্নার শব্দ শুনে অবাক হলো। শব্দ লক্ষ্য করে চলতে চলতে সেই কুয়ার ধারে উপস্থিত হলো। কুয়ার ভিতর উঁকি দিয়ে দেখে, একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে চিৎকার করে কাঁদছে। পথিক বহুকষ্টে তাকে ওপরে তুলে এনে জিজ্ঞেস করল, তুমি কে? এই ভয়ংকর বনে একা কেন এসেছিলে? তোমার এমন দশা কেন হলো?

সত্যি ঘটনা বললে স্বামীর নিন্দা করা হবে। স্বামীর নিন্দা করা অন্যায়, তাই রত্নাবতী বলল, আমি চন্দ্রপুরের বণিক হেমগুপ্তের মেয়ে। আমার নাম রত্নাবতী। আমি স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিলাম। ডাকাতেরা আমার সব গহনা কেড়ে নিয়ে আমাকে কুয়ায় ফেলে দিয়েছিল। আমার স্বামীকে নির্দয়ভাবে মারতে মারতে নিয়ে গেছে। তার কী দশা হয়েছে জানি না।

রত্নাবতীর কথা শুনে পথিক খুব দুঃখ করতে লাগল। তারপর তাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে বাবার বাড়ি পৌঁছে দিল।

রত্নাবতীর বাবা-মা মেয়েকে ওই অবস্থায় ফিরে আসতে দেখে অবাক হলো। মর্মাহত হয়ে জিজ্ঞেস করল, মা, কী করে তোমার এমন দশা হলো?

রত্নাবতী পথিকের কাছে যা বলেছিল, কাঁদতে কাঁদতে বাবা-মাকেও তা-ই বলল।

হেমচন্দ্র বলল, মা, কেঁদো না। আমার মন বলছে, তোমার স্বামী বেঁচে আছে। ডাকাতদের টাকা দরকার, গহনা বিক্রি করে সেই টাকা তারা পাবে। আর টাকা পেলে ডাকাতেরা অকারণে খুন করে না।

এ-সব বলে বণিক মেয়েকে আশ্বাস দিয়ে আবার গহনা বানিয়ে দিল।

এদিকে নয়নানন্দ নিজের বাড়িতে এসে রত্নাবতীর গহনা বিক্রি করে, সেই টাকায় দিনরাত মদ খেয়ে, পাশা খেলে ও নানারকম আমোদ-প্রমোদে কাটিয়ে টাকা শেষ করে আবার আগের মতো ভিখিরি হলো। তখন মনে মনে আবার নতুন ফন্দি আঁটতে লাগল। সে ভাবল, রত্নাবতীকে কুয়ায় ফেলে দেয়ার কথা তার শ্বশুরবাড়ির কেউ জানে না। অতএব একটা ছল করে সেখানে গিয়ে দু-চারদিন কাটিয়ে এক সুযোগে আবার কিছু টাকার ব্যবস্থা করে চলে আসবে।

সবার আগে রত্নাবতীই তাকে দেখতে পেল। সে স্বামীকে আসতে দেখে ভাবল, স্বামী দোষ করলেও গুরুজন। তিনি ভুল করেই আমার ওপর ওইরকম ব্যবহার করেছিলেন। গুরুজনের দোষ ধরা অন্যায়। যা হোক, আমি যে বেঁচে আছি তিনি হয়তো জানেন না; আমাকে দেখলেই পালিয়ে যাবেন। তাই আগে ওঁর ভয় ভাঙানো উচিত।

রত্নাবতী স্বামীর সামনে এসে বলল, তোমার কোনও ভয় নেই। আমি বাবা-মাকে বলেছি, দস্যুরা আমার গহনা কেড়ে নিয়ে আমাকে কুয়ার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। তারপর তোমাকে বেঁধে নিয়ে গেছে। তারা তোমার জন্য খুব চিন্তিত। তোমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি তাদের কাছে যেমন বলেছি, তুমিও সেরকমই বোলো।

রত্নাবতী চলে গেলে ধূর্ত নয়নানন্দ শ্বশুরের কাছে গিয়ে তাকে প্রণাম করল। বণিক তাকে আশীর্বাদ করে সব খবরাখবর নিতে লাগল। রত্নাবতী তাকে যা বলতে বলেছিল, নয়নানন্দ শ্বশুরের কাছে তা-ই বলল। তার কথা শুনে ও ভাব দেখে হেমগুপ্তের মনে খুব মায়া হলো।

তারপর রাত হলো। বহুদিন পরে স্বামীকে দেখে রত্নাবতী খুব খুশি। সে তার সমস্ত নতুন গহনা পরে শোবার ঘরে এল। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর ধূর্ত নয়নানন্দ ঘুমের ভান করে নাক ডাকাতে লাগল। রত্নাবতী দেখল, স্বামী অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সে-ও ঘুমিয়ে পড়ল। তখন সেই পাপিষ্ঠ নয়নানন্দ ছুরি দিয়ে স্ত্রীকে জবাই করে সমস্ত গহনা নিয়ে পালিয়ে গেল।

গল্প শেষ করে শারি বলল, মহারাজ! এই ঘটনা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। সেই থেকে পুরুষজাতের ওপর আমার ঘৃণা ও অবিশ্বাস জন্মেছে।

শারির কথা শুনে, রাজা মৃদু হেসে বললেন, চূড়ামণি, তুমি কেন মেয়েদের ওপর এত বিরক্ত, এবার সেটা বলো।

তখন শুক বলল, মহারাজ, শুনুন, কাঞ্চনপুর নগরে সাগরদত্ত নামে এক শেঠ ছিল। তার একটা পুত্র ছিল; তার নাম শ্রীদত্ত। শ্রীদত্ত বড় সুশীল ও শান্ত স্বভাবের। অনঙ্গপুরের সোমদত্ত শেঠের মেয়ে জয়শ্রীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। কিছুদিন পরে শ্রীদত্ত বাণিজ্য করতে দেশান্তরে গেল। জয়শ্রী তার বাবার বাড়িতেই রইল।

অনেক দিন গেল, শ্রীদত্ত তবুও ফিরল না।

জয়শ্রীর স্বভাব-চরিত্র ভাল ছিল না। সে নানা কুকর্ম করে দিন কাটাতে লাগল। স্বামীর প্রতি তার কোনও আকর্ষণ নেই।

এদিকে অনেকদিন পরে শ্রীদত্ত বাণিজ্য থেকে বাড়ি ফিরে শ্বশুরবাড়ি গেল। একে জামাই, তার ওপর অনেকদিন পরে এসেছে, সেজন্য সোমদত্ত জামাইকে খুব খাতির-যত্ন করল। সারাদিন আমোদ-প্রমোদে কাটিয়ে শ্রীদত্ত রাতে খাওয়ার পর শুতে গেল। কিন্তু জয়শ্রী কিছুতেই স্বামীর কাছে যেতে চায় না। তার মা তাকে অনেক বোঝাল, জয়শ্রী তবু অটল। শেষে মা জোর করে তাকে জামাইয়ের ঘরে দিয়ে এল। স্বামীর ঘরে গেল বটে, কিন্তু জয়শ্রী তার সঙ্গে একটা কথাও বলল না; তার দিকে পিছন ফিরে শুয়ে থাকল। শ্রীদত্ত স্ত্রীকে ভাল ভাল কথা বলে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করল। তবু জয়শ্রীর মন গলল না; সে তেমনি পিছন ফিরে শুয়ে রইল। শ্রীদত্ত জয়শ্রীর জন্য নানারকম মূল্যবান গহনা ও কাপড়চোপড় এনেছিল। জয়শ্রীকে আদর করে দিতে গেলে জয়শ্রী রাগ করে সেগুলো ছুড়ে ফেলল। জয়শ্রীকে কিছুতেই সন্তুষ্ট করতে না পেরে শ্রীদত্ত ঘুমিয়ে পড়ল।

স্বামী ঘুমিয়ে পড়লে জয়শ্রী বিছানা থেকে উঠল। তারপর শ্রীদত্ত যেসব গহনা ও কাপড় এনেছিল, সেগুলো পরে পথে বের হলো। প্রিয় সখির বাড়ি গিয়ে সখির কাছে মনের দুঃখ জানাতে চলল। সেসময় এক চোর ওই পথে দাঁড়িয়ে ছিল। জয়শ্রীকে দেখে তার কৌতূহল হলো। এত রাতে সুন্দরী একটি মেয়ে সেজেগুজে কোথায় যাচ্ছে? গোপনে সে জয়শ্রীর পিছন পিছন চলল।

এদিকে জয়শ্রীর প্রিয় সখি যে-ঘরে ঘুমাত সেখানে অন্য এক লোক ঘুমোচ্ছিল; একটা সাপ এসে তাকে কামড়ে মেরে ফেলল। জয়শ্রী ঘরে ঢুকে ভাবল, তার সখিই ঘুমোচ্ছে। সে তার পাশে শুয়ে কথা বলতে লাগল। চোর একটু দূরে দাঁড়িয়ে সবই দেখছে। সেই ঘরের কাছে এক গাছে বসে একটা পিশাচও এ-সব দেখছিল। সে জয়শ্রীর ওপর ভয়ংকর রেগে গেল। মনে মনে বলল, শ্রীদত্তের মতো স্বামীর ওপর যে স্ত্রী দুর্ব্যবহার করতে পারে, এত রাতে ঘর ছেড়ে বেরোতে পারে, তাকে শাস্তি দেওয়া উচিত। সে ওই মৃত

লোকটির দেহে ঢুকে প্রাণ সঞ্চার করে তার দাঁত দিয়ে জয়শ্রীর নাক কামড়ে কেটে ফেলল। এতক্ষণে জয়শ্রীর বোধোদয় হলো। সে বুঝতে পারল, যার সাথে কথা বলছিল, সে তার সখি নয়, অন্য লোক। আর ঠিক এই সময় তার প্রিয় সখিও সেখানে এসে হাজির হলো। জয়শ্রী কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বিলাপ করতে লাগল। কেঁদে কেঁদে সখিকে বলল, ভাই! আমি কী করে এখন বাড়িতে মুখ দেখাব? আমার বাবা-মা কী বলবেন? এতদিন পর আমার স্বামীও এসেছে। তার কাছ থেকে তোমার বাড়িতে পালিয়ে এসে আমার এমন দশা হলো। আমি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করব। হঠাৎ তার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি জাগল। সে সখিকে বলল, আমি বাড়ি গিয়ে শোবার ঘর থেকে চিৎকার শুরু করব। সকলে ছুটে এসে কী হয়েছে জানতে চাইলে বলব, আমার স্বামী রেগে গিয়ে আমার নাক কেটে দিয়েছে।

জয়শ্রীর সখি বলল, হ্যাঁ, এটাই ভাল, তা-ই করো।

জয়শ্রী বাড়ি ফিরে শোবার ঘরে ঢুকে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। তার কান্না শুনে বাড়ির সবাই ঘরে ঢুকে দেখে, তার নাক নেই। রক্তে কাপড়-চোপড় ভেজা। আর সে মাটিতে পড়ে কাঁদছে। সকলে ব্যস্ত হয়ে কী হয়েছে জানতে চাইলে জয়শ্রী তার স্বামীকে দেখিয়ে বলল, ওই শয়তানটা আমার এই দশা করেছে।

সবাই তখন শ্রীদত্তকে গালাগালি করতে লাগল।

ভাল মানুষ শ্রীদত্ত এ-সবের কিছুই বুঝতে না পেরে ও স্ত্রীর নাককাটা বিকৃত চেহারা দেখে হতবাক হয়ে রইল। মনে মনে তার আফসোস হতে লাগল। ভাবল, জয়শ্রীর স্বভাব-চরিত্রের কথা ভালমত না জেনে আমার শ্বশুরবাড়িতে আসা উচিত হয়নি। জানি না, শেষ পর্যন্ত আমার ভাগ্যে কী ঘটবে।

পরদিন সকালে জয়শ্রীর বাবা সোমদত্ত রাজার কাছে নালিশ করলে, কোতোয়াল এসে শ্রীদত্তকে ধরে নিয়ে গেল। বিচারক জয়শ্রী ও সোমদত্তকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে জয়শ্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, কে তোমার এই দুর্দশা করেছে?

জয়শ্রী তার স্বামীকে দেখিয়ে বলল, ধর্মাবতার! উনি আমার স্বামী। উনিই আমার এই অবস্থা করেছেন।

বিচারক শ্রীদত্তকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এ কাজ কেন করলে?

শ্রীদত্ত বলল, ধর্মাবতার! আমি কিছুই জানি না। কিছু বলতেও পারব না। তবে আমি এ কাজ করি নি। এখন আপনার বিচারে যা ভাল মনে হয়, তা-ই করুন। সাজা দিতে ইচ্ছে করলে দিন। এই বলে, শ্রীদত্ত বিষণ্নমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

বিচারক সমস্ত শুনে আসামী শ্রীদত্তকে শূলে চড়ানোর আদেশ দিলেন।

চোর এতক্ষণ দূরে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। সে বিচারকের সামনে এসে বলল, ধর্মাবতার। আপনি একজন নির্দোষের প্রাণদণ্ড দিচ্ছেন।

চোরের কথা শুনে বিচারক বিব্রত হলেন। তখন চোর তাঁর কাছে একে একে সব কথা বলল। বিচারক তখন সেই সাপে-কাটা মরা লোকটার খোঁজ নিতে বললেন। লোকটিকে পাওয়া গেল। তার মুখের ভিতর জয়শ্রীর নাকের কাটা অংশটিও পাওয়া গেল। সব দেখে নিজের ভুল বুঝতে পেরে বিচারক শ্রীদত্তকে নিরপরাধ ঘোষণা করলেন ও চোরকে পুরস্কার দিয়ে বিদায় করলেন। আর জয়শ্রীর মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে তাকে গাধার পিঠে চড়িয়ে সারা নগরে ঘোরানোর আদেশ দিলেন। সবশেষে তাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেন। তার কাহিনী শেষ করে চূড়ামণি রাজাকে বলল, মহারাজ! মেয়েরা কত খারাপ, বুঝলেন তো?

গল্প শেষ হলো। বেতাল জিজ্ঞেস করল, মহারাজ! নয়নানন্দ ও জয়শ্রীর মধ্যে কে বেশি খারাপ?

রাজা বললেন, আমার মতে দুই-ই সমান।

এ-কথা শুনে বেতাল ইত্যাদি।

পঞ্চম গল্প

বেতাল বলল, মহারাজ! ধারানগরে মহাবল নামে একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তাঁর দূতের নাম ছিল হরিদাস। ওই দূতের একটা মেয়ে ছিল; তার নাম মহাদেবী। মহাদেবী খুব সুন্দরী ও গুণবতী ছিল। তার বিয়ের বয়স হলে বাড়িতে আলোচনা শুরু হলো। একদিন মহাদেবী তার পিতাকে বলল, বাবা! এমন লোকের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন, যিনি সব বিষয়ে গুণবান! মেয়ের এমন কথা শুনে হরিদাস খুব সন্তুষ্ট হয়ে পাত্র খুঁজতে লাগল।

এমন সময় রাজা একদিন দূতকে বললেন, হরিদাস! দক্ষিণদেশে হরিশ্চন্দ্র নামে এক রাজা আছে। রাজা আমার পরম বন্ধু। অনেকদিন তার কোনো সংবাদ না পেয়ে খুব চিন্তিত আছি। তুমি গিয়ে তার সংবাদ নিয়ে এসো।

হরিদাস তখন দক্ষিণদেশে রওনা হলো। কয়েক দিন পর হরিশ্চন্দ্রের রাজধানীতে পৌঁছে তাঁর কাছে রাজা মহাবলের সংবাদ জানাল। বন্ধুর সংবাদ পেয়ে রাজা হরিশ্চন্দ্র খুব খুশি হলেন; হরিদাসকে যথেষ্ট পারিতোষিক দিয়ে তাকে রাজধানীতে কিছুদিন থেকে যেতে অনুরোধ করলেন। হরিদাস রাজার অনুরোধে সেখানে রয়ে গেল।

একদিন হরিদাস রাজসভা থেকে ফিরে দেখল, তার আবাসে একটা ব্রাহ্মণের ছেলে তার জন্য অপেক্ষা করছে। সে ব্রাহ্মণের ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কে? কী জন্য এসেছ?

ছেলেটি বলল, আপনার এক পরমাসুন্দরী গুণবতী মেয়ে আছে। আমার সঙ্গে তার বিয়ে দিন।

হরিদাস বলল, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি সমস্ত বিষয়ে যে নিপুণ হবে, তার সঙ্গেই আমার মেয়ের বিয়ে দেব।

ছেলেটি বলল, বাল্যকাল থেকে আমি নানা বিদ্যা শিক্ষা করছি। নানা বিদ্যায় নিপুণ হয়েছি। আমি এক অদ্ভুত রথ বানিয়েছি। তাতে চড়ে এক বছরের পথ একদণ্ডে পার হওয়া যায়।

শুনে হরিদাস সন্তুষ্ট হলো; বলল, তোমার সঙ্গেই আমার মেয়ের বিয়ে দেব। কাল তুমি রথ নিয়ে এসো।

পরদিন সকাল হলেই ছেলেটি রথ নিয়ে এল। হরিদাস রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আগে থেকেই যাবার জন্য তৈরি ছিল। দুজনে রথে চড়ে নিমেষে ধারানগরে এসে পৌছল।

হরিদাস যখন দক্ষিণদেশে ছিল, সেসময় তার স্ত্রী ও পুত্র দুজনে দুটি ব্রাহ্মণের ছেলেকে পছন্দ করে তাদের সঙ্গে মহাদেবীর বিয়ে দেবে বলে কথা দিয়ে রেখেছে। হরিদাস উপস্থিত না থাকায় বিয়ে হয়নি। সে বাড়ি এলে সেই ছেলে দুটোকেও খবর দিয়ে আনানো হলো।

মহাদেবীর জন্য তিন পাত্র উপস্থিত দেখে হরিদাস বেকায়দায় পড়ে গেল। তিনজনেই রূপবান ও গুণবান। এদের মধ্যে কার হাতে মহাদেবীকে দান করবে বুঝে উঠতে পারল না। সে তিনজনকে বলল, তোমরা আজ আমার বাড়িতে থাকো। আমি আমার ছেলে ও স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে সব ঠিক করব।

পাত্ররা হরিদাসের অনুরোধে সেদিন তার বাড়িতে রয়ে গেল। কপাল খারাপ, সে-রাতে বিন্ধ্যাচলের এক রাক্ষস এসে মহাদেবীকে ধরে নিয়ে গেল।

সকালে ঘুম থেকে উঠে সকলে দেখে, মহাদেবী নেই। সকলে মহাব্যস্ত হয়ে তার খোঁজ করতে লাগল; কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না।

পাত্রদের মধ্যে একজনের সমাধিবলে ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দেখার ক্ষমতা ছিল। সে হরিদাসকে বলল, আপনি ভাববেন না। আমি জেনেছি, এক রাক্ষস আপনার মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিন্ধ্য পর্বতে লুকিয়ে রেখেছে।

দ্বিতীয় পাত্র বলল, আমি শব্দভেদী বাণ দিয়ে শত্রুকে বধ করতে পারি। কোনরকমে সেখানে যেতে পারলে রাক্ষসকে মেরে মহাদেবীকে উদ্ধার করতে পারব।

তৃতীয় পাত্র বলল, তাহলে আমার এই রথে চড়ে এখনি সেখানে চলে যাওয়া যাক।

তখন সেই রথে চড়ে সবাই বিন্ধ্য পর্বতে গেল ও শব্দভেদী বাণ দিয়ে রাক্ষসকে বধ করে মহাদেবীকে উদ্ধার করে ধারানগরে ফিরে এল। কিন্তু তারপর তিন পাত্রের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল। তিনজনেই মহাদেবীকে বিয়ে করার দাবি জানাল। তিনজনেরই এক কথা, আমি মহাদেবীকে উদ্ধার করেছি। সুতরাং আমিই তাকে বিয়ে করব।

তখন হরিদাস পড়ে গেল বিপাকে। কার কাছে মেয়ের বিয়ে দেয়?

গল্প শেষ করে বেতাল রাজাকে জিজ্ঞেস করল, মহারাজ! তিনজনের মধ্যে মহাদেবীকে বিয়ে করার অধিকারী কে?

রাজা বললেন, যে রাক্ষসের প্রাণবধ করেছে।

বেতাল বলল, কেন? তিনজনেই রূপবান, বিদ্বান, বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। তিনজনেই মহাদেবীকে উদ্ধার করতে সাহায্য করেছে। তাহলে রাক্ষসবধকারী কেন মহাদেবীকে বিয়ে করার অধিকারী হবে?

রাজা বললেন, তোমার কথা ঠিক, কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার করলে, যে রাক্ষস মেরেছে আসল কাজটি সে-ই করেছে। রাক্ষসকে মারতে না পারলে মেয়েটিকে উদ্ধার করেই আনা যেত না। বিয়ে তো পরের কথা।

এ-কথা শুনে বেতাল ইত্যাদি।

ষষ্ঠ গল্প

বেতাল বলল, মহারাজ, ধর্মপুর নগরে ধর্মশীল নামে এক রাজা ছিলেন। রাজা বড় গুণবান ও ধার্মিক। তার মন্ত্রীর নাম অন্ধক। রাজা মন্ত্রীর পরামর্শে কাত্যায়নী দেবীর মন্দির বানিয়ে প্রতিদিন ভক্তিভরে দেবীর পূজা করতে লাগলেন। কিন্তু রাজার মনে যে এক দুঃখ ছিল, তা দূর হলো না। রাজা পুত্রের মুখ দেখতে পেলেন না।

একদিন মন্ত্রীর পরামর্শে রাজা দেবীর সামনে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে জোড়হাতে দেবীকে বললেন, মা, তুমি ভক্তের আশা পূরণ করো। আমি তোমার শরণাপন্ন হয়েছি। আমার মনের আশা পূরণ করো। তারপর স্তব

শেষ করে, রাজা আবারও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে জোড়হাতে দেবীর সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তখন দৈববাণী হলো, রাজন! আমি তোমার ওপর প্রসন্ন হয়েছি। তুমি বর প্রার্থনা করো।

রাজা বললেন, দেবী! যদি প্রসন্ন হয়ে থাকো, তাহলে আমায় এই বর দাও যেন আমি শীঘ্রই পুত্রের মুখ দেখি। দেবী বলল, তথাস্তু। শীঘ্রই তোমার একটি শান্ত, সুশীল ও গুণবান পুত্র হবে।

দেবীর বরে যথাসময়ে রাজার এক পুত্র হলো। রাজা মহাসমারোহে দেবীর পূজা করলেন। নগরে আনন্দোৎসব আরম্ভ হলো।

একদিন দীনদাস নামে এক তাঁতী কাজের সন্ধানে তার বন্ধুর সঙ্গে রাজধানীতে যাচ্ছিল। সেখানে তার স্বজাতীয় একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখে মনে মনে তার রূপের প্রশংসা করে প্রতিজ্ঞা করল, মেয়েটিকে আমি বিয়ে করবই। দেবী কাত্যায়নীর দয়ায় আমাদের রাজা বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের মুখ দেখেছেন। দেবীর দয়া হলে, আমিও ওই মেয়েটিকে বিয়ে করতে পারব।

এই ভেবে সে কাত্যায়নী দেবীর মন্দিরে গিয়ে খুব ভক্তির সঙ্গে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে জোড়হাতে বলতে লাগল, মা! যদি ওই মেয়েটির সঙ্গে আমার বিয়ে হয়, তাহলে, নিজের হাতে আমার মাথা কেটে তোমার পূজা দেব। এভাবে মানত করে সে দেবীকে প্রণাম করে বন্ধুর সঙ্গে বাড়ি ফিরে এল।

কিছুদিন যায়। ওই মেয়েটির জন্য দীনদাস বড় দুঃখে দিন কাটায়। তার মনে আনন্দ নেই; কাজেও উৎসাহ দেখা যায় না। দীনদাসের এই অবস্থা দেখে তার বন্ধু অবশেষে দীনদাসের বাবাকে ব্যাপারটি জানাল। দীনদাসের বাবা চিন্তিত হয়ে ভাবল, মেয়েটির বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে দেখা যাক। দীনদাসের যা অবস্থা দেখছি, তাতে মেয়েটির সাথে ওর বিয়ে হওয়া দরকার।

তারপর দীনদাসকে সঙ্গে নিয়ে তার বাবা মেয়ের বাবার বাড়িতে গেল। আলাপ-পরিচয়ের পর দীনদাসের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব করল। মেয়ের বাবা দীনদাসের বাবার প্রস্তাবে রাজি হলো। তারপর ওই মেয়েটির সঙ্গে দীনদাসের বিয়ে হয়ে গেল। দুজনে মহাসুখে দিন কাটাতে লাগল।

কিছুদিন পরে শ্বশুরবাড়িতে দীনদাসকে নিমন্ত্রণ করা হলো। সে তার স্ত্রী ও বন্ধুর সঙ্গে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে চলল। রাজধানীর কাছে পৌঁছে সে দেখল কাছেই কাত্যায়নী দেবীর মন্দির রয়েছে। তখন তার মানতের কথা মনে পড়ল। সে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে ভাবল, আমি নিতান্ত মিথ্যেবাদী ও পাপিষ্ঠ। দেবীর কাছে মানত করে পূরণ করলাম না। জন্ম-জন্মান্তরেও আমার এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। যা হোক, এখনই দেবীর পূজা করে ক্ষমা প্রার্থনা করব।

সে তার বন্ধুকে বলল, বন্ধু! তুমি এখানে কিছুক্ষণ বসো। আমি দেবী দর্শন করে আসি।

দীনদাস মন্দিরের পাশের পুকুরে স্নান করে বিধিমত দেবীর পূজা করল। তারপর দেবীকে বলল, মা! অনেক দিন আগে তোমার কাছে মানত করেছিলাম। আজ তা পালন করছি। বলে মন্দিরে রাখা খড়গ দিয়ে নিজের মাথা কেটে ফেলল।

এদিকে দীনদাসের আসার দেরি দেখে তার বন্ধু দীনদাসের স্ত্রীকে বলল, আপনি এখানে বসুন, আমি বন্ধুকে ডেকে আনি।

দীনদাসের বন্ধু মন্দিরে গিয়ে দেখে তার বন্ধুর ধড় আর মাথা আলাদা হয়ে পড়ে আছে। দেখে তার মনে ভয় হলো। সে ভাবল, লোকে ভাববে আমিই তাকে খুন করেছি। কেউই বিশ্বাস করবে না সে আত্মহত্যা করেছে। অকারণে দোষী হওয়ার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। এই ভেবে সে-ও খড়গ দিয়ে নিজের মাথা কেটে ফেলল।

দীনদাসের স্ত্রী দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে তার স্বামী ও বন্ধুকে খুঁজতে মন্দিরে গেল। দেখল, তার স্বামী ও বন্ধু মরে মাটিতে পড়ে আছে। দুজনেরই ধড় থেকে মাথা আলাদা হয়ে গেছে। সে ভাবল, বোধহয় পূর্বজন্মে আমি অনেক পাপ করেছিলাম, তাই এই জন্মে আমার কপালে এই দুঃখ। সারাজীবন বিধবা হয়ে থাকার চেয়ে আমার মৃত্যুই ভাল। এই ভেবে, সে খড়গ দিয়ে নিজের গলা কাটার উপক্রম করতেই দেবী সেখানে সশরীরে হাজির হয়ে বলল, মেয়ে, আমি তোমার সাহস দেখে সন্তুষ্ট। তুমি বর চাও।

দীনদাসের স্ত্রী বলল, মা, যদি প্রসন্ন হয়ে থাকো, তবে এদের দুজনকে বাঁচিয়ে দাও।

দেবী বলল, তথাস্তু। তুমি এদের দেহের সঙ্গে মাথা লাগিয়ে দাও, তাহলেই এরা বেঁচে উঠবে। বলেই দেবী অদৃশ্য হলো।

দীনদাসের স্ত্রী আনন্দে আত্মহারা হলো। তাড়াহুড়ায় ভুল করে সে দীনদাসের মাথা তার বন্ধুর শরীরে, আর বন্ধুর মাথা দীনদাসের শরীরে লাগিয়ে দিল। দুজনে বেঁচে উঠল।

গল্প শেষ করে বেতাল জিজ্ঞেস করল, এখন ওই দুজনের মধ্যে কে ওই মেয়েটির স্বামী হবে?

রাজা বললেন, যে ব্যক্তির শরীরে দীনদাসের মাথা আছে। কেননা দেহের মধ্যে মাথাটাই হলো আসল।

এ-কথা শুনে বেতাল ইত্যাদি।

সপ্তম গল্প

বেতাল বলল, মহারাজ! চম্পানগরে চন্দ্রাপীড় নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর রানীর নাম ছিল সুলোচনা ও মেয়ের নাম ত্রিভুবনসুন্দরী। মেয়েটি বড় হলে রাজা তার বিয়ের জন্য খুব চিন্তিত হলেন। উপযুক্ত পাত্র কোথায় পাওয়া যায়? অন্য দেশের রাজারাও শুনলেন রাজা চন্দ্রাপীড়ের এক সুন্দরী মেয়ে আছে, রাজা তার বিয়ের চেষ্টা করছেন। তখন সকলে মেয়েটিকে বিয়ে করার জন্য নিজের নিজের ছবি এঁকে চন্দ্রাপীড়ের কাছে পাঠাতে লাগলেন। চন্দ্রাপীড় সেগুলো মেয়ের কাছে পাঠালেন। কিন্তু মেয়ে কাউকে পছন্দ করল না। সে বলল, শুধু চেহারা দেখে নয়, যে বিদ্যা ও বিক্রমে শ্রেষ্ঠ হবে, আমি তাকেই বিয়ে করব।

কিছুদিন পর বিদেশ থেকে রাজবাড়িতে চারজন পাত্র উপস্থিত হলো। তারা রাজার কাছে নিজের গুণের পরিচয় দিতে লাগল।

প্রথম জন বলল, আমি বাল্যকাল থেকে নানা বিদ্যা শিখেছি। আমি প্রতিদিন একটা করে সুন্দর বস্ত্র বুনতে পারি, তার দাম পাঁচ রত্ন। আর আমি রূপবান কি না, মহারাজ তা নিজেই দেখছেন।

দ্বিতীয় জন বলল, আমি জলচর, স্থলচর সব পাখির ভাষা জানি। আমার সঙ্গে গায়ের জোরে কেউ পারে না। আমি রূপবান কি না, মহারাজ স্বচক্ষে দেখছেন।

তৃতীয় জন বলল, আমার রূপও মহারাজ দেখছেন। গুণের বিষয় এইটুকু বলব, আমি শাস্ত্রে অদ্বিতীয়।

চতুর্থজন বলল, আমার রূপের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। মহারাজ আমাকে স্বচক্ষে দেখছেন। শাস্ত্রবিদ্যায় আমার সমান কেউ নেই। আমি শব্দভেদী বাণ ছুড়তে পারি।

চারজনের গুণ ও রূপের পরিচয় পেয়ে রাজা চন্দ্রাপীড় কিছুতেই স্থির করতে পারলেন না কাকে মেয়ে দেবেন। চারজনই তো রূপে-গুণে অসাধারণ। তখন রাজা মেয়েকে বললেন, তুমি এই চারজনের মধ্যে একজনকে বর পছন্দ করো।

পিতার কথা শুনে ত্রিভুবনসুন্দরী লজ্জায় মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল।

বেতাল জিজ্ঞেস করল, মহারাজ! চারজনের মধ্যে কে ত্রিভুবনসুন্দরীর স্বামী হওয়ার উপযুক্ত?

রাজা বললেন, যে বস্ত্র বুনে বিক্রি করে, সে শূদ্র; যে পক্ষীর ভাষা জানে, সে বৈশ্য; যে সব শাস্ত্রে পণ্ডিত সে ব্রাহ্মণ; কিন্তু যে শাস্ত্রবিদ্যায় অসাধারণ,

সে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়, মেয়ের স্বজাতীয়। সুতরাং শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে সে-ই মেয়ের পতি হওয়ার যোগ্য।

এ-কথা শুনে বেতাল ইত্যাদি।

অষ্টম গল্প

বেতাল বলল, মহারাজ! মিথিলানগরে গুণাধিপ নামে এক রাজা ছিলেন। চিরঞ্জীব নামে দক্ষিণদেশবাসী এক রাজপুত রাজার গুণ ও দয়ার কথা শুনে তাঁর কাছে চাকরির জন্য এল। কিন্তু অদৃষ্টক্রমে রাজা তখন রাজকার্য ছেড়ে, রাতদিন কেবল অন্তঃপুরে মহিলাদের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছিলেন। এক বছর চলে গেল, রাজা তবুও সভায় এলেন না। চিরঞ্জীব খরচের জন্য যে টাকা সঙ্গে এনেছিল, তা ফুরিয়ে গেল।

নিঃসম্বল হয়ে চিরঞ্জীব ভাবল, যে ব্যক্তি এক বৎসরেও রাজসভায় আসে না, রাজকার্যও দেখে না, তার কাছে চাকরির প্রার্থনা করলে তা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা কম। আর কখন যে এ লোকের দেখা পাব, তারও ঠিক নেই। এদিকে আমি নিঃসম্বল হলাম। এখন ভিক্ষা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই আমার। আর ভিক্ষার চেয়ে মৃত্যু ভাল। এতদিন আমি বৃথা আশায় কাটালাম। তবে একটা লাভ আমার হয়েছে, আমি আশাকে জয় করেছি। যে আশাকে জয় করেছে, সে যথার্থ সুখী। সুতরাং আমি সংসার ছেড়ে বনে গিয়ে তপস্যা করব। এই ভেবে সে তপস্যা করার জন্য বনে চলে গেল।

কিছুদিন পরে রাজা গুণাধিপ আবার রাজকার্যে মন দিলেন। নিয়মিত রাজসভায় বসতে লাগলেন। তারপর একদিন রাজা সৈন্যসামন্ত নিয়ে বনে শিকার করতে গেলেন। ঘোড়ায় চড়ে বনে বনে ঘুরে অবশেষে এক হরিণের পিছনে ছুটতে ছুটতে রাজা একা গভীর বনে এসে পড়লেন।

এত গভীর বন দেখে রাজার মনে বড় ভয় হলো। তার ওপর রাজা আবার ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর। চারপাশে পানির অন্বেষণ করতে করতে রাজা হঠাৎ এক কুটিরের সামনে এসে পড়লেন। কুঁড়েঘর দেখে রাজার মনে সাহস হলো। ওই কুটিরে সেই রাজপুত চিরঞ্জীব তপস্যা করছিল। রাজা সেই কুটিরের দরজায় দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে পানি চাইলে চিরঞ্জীব রাজাকে ফল ও শীতল পানি দিল।

সেই ফল ও পানি খেয়ে রাজার ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর হলো; তাঁর মনে হতে লাগল যেন নবজীবন পেলেন। এতক্ষণ রাজা চিরঞ্জীবের দিকে ভাল করে তাকান নি; এবার তাকে ভাল করে দেখলেন; রাজার মনে হলো ইনি প্রকৃত

ঋষি নন। তখন রাজা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, মহাশয়! আপনি আমার যে উপকার করলেন, তার জন্য আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। কিন্তু একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করছি; অনুগ্রহ করে আমার অপরাধ মার্জনা করবেন। আপনার কাজকর্ম সবই বিশুদ্ধ তপস্বীর মতো; কিন্তু আপনার আচার দেখে মনে হয়, আপনি প্রকৃত ঋষি নন। দয়া করে আমার সংশয় দূর করলে খুব বাধিত হব।

চিরঞ্জীব অগত্যা রাজার কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, মহারাজ! আমি রাজা গুণাধিপের গুণের কথা শুনে তার কাছে চাকরির জন্য গিয়েছিলাম; কিন্তু রাজা রাজকার্য ছেড়ে সর্বদা অন্তঃপুরে থাকতেন। এক বছর অপেক্ষা করেও তাঁর দেখা পাইনি। সঙ্গে সম্বল যা ছিল, তাও ফুরাল। ভিক্ষা করা ছাড়া আর উপায় ছিল না। এতে সংসারের ওপর বিতৃষ্ণা জন্মাল; তপস্যা করার জন্য এই বনে চলে এলাম। আমি ক্ষত্রিয়; মনে এখনও বিষয়-বাসনা আছে। আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন।

চিরঞ্জীবের কথা শুনে রাজা লজ্জা পেলেন। কিন্তু রাজা তখন নিজের পরিচয়ই দিলেন না। চিরঞ্জীবের অনুমতি নিয়ে সেদিন রাতে ওই কুটিরেই কাটালেন।

পরদিন সকাল হলে রাজা গুণাধিপ নিজের পরিচয় দিয়ে চিরঞ্জীবকে রাজধানীতে নিয়ে গেলেন এবং তাকে নিজের কাছে রেখে দিলেন। চিরঞ্জীবও প্রাণপণে রাজার কাজ করে।

একদিন রাজা বিশেষ এক কাজে চিরঞ্জীবকে বিদেশে পাঠালেন। কাজ শেষ করে ফেরার পথে চিরঞ্জীব দেখল এক পুকুরের ধারে একটা মন্দির। সে মন্দিরে গিয়ে দেবদর্শন করল। মন্দির থেকে বেরোতেই এক পরমাসুন্দরী মেয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল। চিরঞ্জীব তাকে দেখে আর চোখ ফেরাতে পারে না; তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। দেখে মেয়েটি বলল, ওহে যুবক! তুমি কীজন্য এখানে এসেছ এবং এমন করে আমার দিকে তাকিয়েই বা আছ কেন?

চিরঞ্জীব বলল, আমি রাজকার্যে বিদেশে গিয়েছিলাম! কাজ শেষ করে স্বদেশে যাচ্ছি। কিন্তু হঠাৎ এখানে তোমাকে দেখে বড় অবাক হয়েছি।

মেয়েটি বলল, তুমি যদি ওই পুকুরে স্নান করো, তাহলে আমি তোমার কথা মেনে চলব।

মেয়েটির কথা শুনে চিরঞ্জীব খুশি মনে সেই পুকুরে ডুব দিল। কিন্তু পানি থেকে মাথা তুলেই দেখে, নিজের বাড়িতে চলে এসেছে। অবাক হয়ে ভেজা কাপড় ছেড়ে রাজার কাছে গিয়ে সব কথা বলল। এই অদ্ভুত কথা শুনে রাজা বললেন, তুমি শীঘ্র আমাকে সেখানে নিয়ে চলো।

তখন দুজনে রথে চড়ে সেই পুকুরের তীরে গিয়ে পৌঁছলেন। রথ থেকে নেমে সেই মন্দিরে গিয়ে দেবদর্শন করে বের হতেই সেই সুন্দরী মেয়েটি রাজার সামনে এসে দাঁড়াল; তারপর বলল, মহারাজ! আপনি যে হুকুম করবেন আমি তাই করব।

রাজা বললেন, যদি তুমি আমার কথামত কাজ করতে চাও, তাহলে আমার প্রিয়পাত্র চিরঞ্জীবকে বিয়ে করো।

মেয়েটি বলল, আমি আপনাকে বিয়ে করব বলে ঠিক করেছি, এ অবস্থায় কেমন করে একে বিয়ে করি?

রাজা বললেন, তুমি এইমাত্র প্রতিজ্ঞা করেছ, আমার কথামত কাজ করবে। অতএব প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে চিরঞ্জীবকে বিয়ে করো।

অবশেষে রাজার কথায় মেয়েটি রাজি হলো। রাজা চিরঞ্জীবের সঙ্গে সেই মেয়েটির গান্ধর্বমতে বিয়ে দিয়ে দুজনকে রাজধানীতে নিয়ে গেলেন।

রাজার অনুগ্রহে চিরঞ্জীব তার স্ত্রীর সঙ্গে পরমসুখে দিন কাটাতে লাগল।

গল্প শেষ হলে বেতাল জিজ্ঞেস করল, মহারাজ! রাজা ও চিরঞ্জীবের মধ্যে কে বেশি সুজন ও উদার?

রাজা বললেন, চিরঞ্জীব।

বেতাল জিজ্ঞেস করল, কেন?

রাজা শেষে চিরঞ্জীবের অনেক উপকার করলেন সত্যি, কিন্তু সেই বনে রাজাকে ফল ও পানি দিয়ে চিরঞ্জীব যে উপকার করেছিল, তার সাথে রাজার উপকারের তুলনা হয় না।

এ-কথা শুনে বেতাল ইত্যাদি।

নবম গল্প

বেতাল বলল, মহারাজ! মগধপুর নগরে বীরবর নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর রাজ্যে হিরণ্যদত্ত নামে এক ধনী বণিক ছিল। ওই বণিকের মদনসেনা নামে একটি মেয়ে ছিল। মেয়েটি বড় সুন্দরী। বসন্তকালে একদিন ওই মেয়েটি তার সখিদের সঙ্গে বাগানে ঘুরছিল। এমন সময় ধর্মদত্ত নামে আরেক বণিকের ছেলে সোমদত্তও বেড়ানোর জন্য ওই বাগানে এল। সে মেয়েটির রূপে মুগ্ধ হয়ে তার কাছে গিয়ে বলল, সুন্দরী! তুমি আমাকে বিয়ে করো। তুমি যদি আমাকে বিয়ে না করো, তাহলে তোমার সামনে আমি আত্মহত্যা করব।

সোমদত্তের কথা শুনে মদনসেনা তাকে অনেক সদুপদেশ দিল, অনেক বোঝাল। কিন্তু সোমদত্ত তার কথা মানল না। মদনসেনা বুঝল, তার জন্য

যুবকটি সত্যিই আত্মহত্যা করবে। যুবকের প্রাণরক্ষা করার জন্য সে বলল, আরেকজনের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে। আগামী পঞ্চ দিবসে আমার বিয়ে হবে। তারপর আমি শ্বশুরবাড়ি যাব। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করছি, তোমার সঙ্গে দেখা না করে আমি স্বামীসেবা করব না। তুমি এখন বাড়ি যাও।

সোমদত্ত মদনসেনার কথায় শান্ত হয়ে বাড়ি চলে গেল।

তারপর পঞ্চ দিবসে মদনসেনার বিয়ে হলো। বিয়ের পর সে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল।

তখন বেশ রাত হয়েছে। সকলে মদনসেনাকে শোবার ঘরে দিয়ে এল। কিন্তু সে স্বামীর সঙ্গে কথা বলল না; জড়সড় হয়ে বিছানার একপাশে চুপ করে বসে রইল। স্বামী তাকে অনেক ভাল ভাল কথা বলতে লাগল। মদনসেনা জবাব দিল না। স্বামী তার কথা না বলার কারণ জিজ্ঞেস করলে সোমদত্তের সঙ্গে বাগানে দেখা হওয়ার পর যা যা ঘটেছে মদনসেনা সব খুলে বলল। তারপর বলল, এখন তুমি যদি আমাকে তার কাছে যেতে না দাও তাহলে আমি আত্মহত্যা করব।

মদনসেনার কথা শুনে স্বামী তাকে প্রথমে অনেক নিষেধ করল। তবুও মদনসেনা তার কথায় অটল রইল। তখন স্বামী বলল, প্রতিজ্ঞা পালন করা অবশ্য কর্তব্য। ঠিক আছে, তুমি যাও।

মদনসেনা স্বামীর সম্মতি নিয়ে সোমদত্তের বাড়ি রওনা হলো। রাত তখন অনেক। মদনসেনা পথ দিয়ে একা চলছে। এমন সময়ে এক চোর এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি কে? সারা গায়ে গহনা পরে এত রাতে একা একা কোথায় যাচ্ছ? তোমার ভয় নেই?

মদনসেনা জবাব দিল, আমি বণিক হিরণ্যদত্তর মেয়ে। আমার নাম মদনসেনা। প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য আমি সোমদত্তের কাছে যাচ্ছি।

মদনসেনার কথা শুনে চোর একটু হাসল। তারপর মদনসেনার গা থেকে সব গহনা খুলে নেয়ার উপক্রম করতেই সে হাতজোড় করে চোরের কাছে সব ঘটনা প্রকাশ করে বলল, ভাই, আমি বহুকষ্টে স্বামীকে রাজি করিয়েছি। তুমি আমার প্রতিজ্ঞা পালনে বাধা দিও না। তুমি এইখানে থাকো। আমি প্রতিজ্ঞা করছি ফেরার সময় তোমাকে সব গহনা দিয়ে যাব।

মদনসেনার কথায় বিশ্বাস করে চোর সেখানে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। সোমদত্তের ঘরে গিয়ে মদনসেনা দেখল, সোমদত্ত ঘুমাচ্ছে। মদনসেনা তার ঘুম ভাঙাল। সোমদত্ত মদনসেনাকে দেখে অবাক হয়ে বলল, এই গভীর রাতে তুমি একা কোথা থেকে এলে?

মদনসেনা বলল, সেদিন বাগানে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তা পালন করতে এসেছি। আজ আমার বিয়ে হয়েছে। আমি শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছি।

সোমদত্ত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তোমার প্রতিজ্ঞাপালনে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি আজ মুক্ত হলে। ফিরে গিয়ে মন দিয়ে স্বামীসেবা করো।

মদনসেনা সোমদত্তের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি ফিরে চলল। চোর তখনও পথে বসে তার অপেক্ষা করছে। মদনসেনাকে এত শীঘ্র ফিরতে দেখে সে তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করল। মদনসেনা সব কথা বললে চোর সন্তুষ্ট হয়ে বলল, আমি তোমার গহনাগুলো চাই না। তুমি খুব সৎ ও সত্যবাদী। তুমি নিশ্চিন্তে শ্বশুরবাড়ি চলে যাও। এই বলে চোর চলে গেল।

মদনসেনাও স্বামীর কাছে ফিরে এল। কিন্তু এবার আর সে মদনসেনার ওপর সন্তুষ্ট হতে পারল না; অসন্তুষ্ট হয়ে শুয়ে রইল।

গল্প শেষ করে বেতাল জিজ্ঞেস করল, মহারাজ! মদনসেনা, তার স্বামী, চোর ও সোমদত্ত, এই চারজনের মধ্যে কার ভদ্রতা বেশি?

রাজা বললেন, চোরের।

বেতাল জিজ্ঞেস করল, কেন?

মদনসেনার স্বামী তাকে খুশিমনে সোমদত্তের বাড়ি যেতে দেয় নি, তাহলে স্ত্রী ফিরে এলে সে অসন্তুষ্ট হত না। আর সোমদত্তও কেবল রাজদণ্ডের ভয়ে মদনসেনার কোনও ক্ষতি করে নি; তার প্রতিজ্ঞাপালন দেখে মুগ্ধ হয়ে নয়। আর, স্বামীর ঘর ছেড়ে গিয়ে মদনসেনার ওই অন্যায় প্রতিজ্ঞাপালন করা নিতান্তই অনুচিত হয়েছে। কিন্তু চোরেরা টাকার জন্যই চুরি করে। সে মদনসেনার কথা শুনে এত টাকার লোভ সংবরণ করল, সেটা কম উদারতা নয়।

এ-কথা শুনে বেতাল ইত্যাদি।

দশম গল্প

বেতাল বলল, মহারাজ! গৌড়দেশে বর্ধমান নগরে ধর্মধ্বজ নামে এক রাজা ছিলেন। বসন্তকালে একদিন তাঁর তিন রানীকে নিয়ে উপবনে বেড়াতে গেলেন। সেই উপবনে একটা চমৎকার পুকুর ছিল। তাতে অজস্র পদ্ম ফুটে

থাকতে দেখে রাজা নিজেই পানিতে নেমে কয়েকটি ফুল তুলে এনে এক রানীর হাতে দিলেন। হঠাৎ একটা ফুল রানীর হাত থেকে তার বাঁ-পায়ের ওপর পড়ল। ফুলের আঘাতে রানীর পা ভেঙে গেল। রাজা ব্যস্ত হয়ে রানীর পায়ের সেবাযত্ন করতে লাগলেন।

এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এল। সেই সঙ্গে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে চাঁদ উঠল। দ্বিতীয় রানীর গায়ে জ্যোৎস্না লাগতেই তার চামড়া ঝলসে গেল।

আর, ঠিক সেই সময়ে উপবনের পাশে এক গৃহস্থের বাড়িতে উদূখলের শব্দ হলো। সেই শব্দ তৃতীয় রানীর কানে যেতেই তার ভয়ংকর মাথা ধরল; সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

বেতাল জিজ্ঞেস করল, মহারাজ! রাজার এই তিন রানীর মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি সুকুমারী?

রাজা বললেন, জ্যোৎস্নায় যার গা ঝলসে গেছে, আমার মতে সে-ই সবচেয়ে বেশি সুকুমারী।

এ-কথা শুনে বেতাল ইত্যাদি।

একাদশ গল্প

বেতাল বলল, মহারাজ! পুণ্যপুর নগরে বল্লভ নামে এক রাজা ছিলেন। রাজা প্রজাদের বড় ভালবাসতেন। তাঁর মন্ত্রীর নাম ছিল সত্যপ্রকাশ। রাজা একদিন মন্ত্রীকে বললেন, দেখো, আমি কিছুদিন বিশ্রাম করব; তুমি আমার হয়ে রাজকার্যের ভার নাও। এই বলে রাজা সত্যপ্রকাশের ওপর সব রাজ্যের ভার দিয়ে নিশ্চিতমনে বিশ্রাম ভোগ করতে লাগলেন। এদিকে সত্যপ্রকাশও দিনরাত কঠিন রাজকার্য করে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

একদিন মন্ত্রী নিজের বাড়িতে নির্জনে বসে আছেন। তাঁর মুখ বিষণ্ণ। এমন সময় তাঁর স্ত্রী এসে জিজ্ঞেস করল, আজকাল সব সময় তোমাকে চিন্তিত দেখি। তোমার কী হয়েছে? দিন দিন এমন দুর্বলই বা হয়ে পড়ছ কেন?

সত্যপ্রকাশ বলল, রাজা আমার ওপর তাঁর রাজ্যের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করছেন। দিনরাত রাজ্যের নানা বিষয়ে চিন্তা করে করে আমি দুর্বল হয়ে পড়ছি।

স্ত্রী বলল, তুমি এতদিন একা সব রাজ্য চালালে, এখন রাজার কাছ থেকে কিছুদিনের ছুটি নিয়ে তীর্থ ভ্রমণ করে এসো!

সত্যপ্রকাশ স্ত্রীর কথামত রাজার কাছ থেকে কিছুদিনের ছুটি নিয়ে তীর্থভ্রমণে বেরোল। নানা তীর্থ ঘুরে রাজা শেষে সেতুবন্ধ রামেশ্বরে পৌঁছল। সেখানে সমুদ্রের ধারে মহাদেবের মন্দির। মন্ত্রী মন্দিরের মূর্তি দেখে বেরোতেই দেখতে পেল সমুদ্রের নীল পানি থেকে একটা বিশাল সোনার গাছ উঠে এসেছে, আর তার এক ডালে বসে একটা অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে বীণা বাজিয়ে মধুর সুরে গান গাইছে। সত্যপ্রকাশ একদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে গাছটি সমুদ্রের পানিতে তলিয়ে গেল।

এই অদ্ভুত ঘটনা দেখে সত্যপ্রকাশ তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে এল এবং রাজাকে জানাল। শুনে রাজার মনেও কৌতূহল জন্মাল। রাজা আবার মন্ত্রীর ওপর রাজ্যের ভার দিয়ে ওই অদ্ভুত ব্যাপার দেখার জন্য সেতুবন্ধ রামেশ্বরে চলে গেলেন।

সেখানে পৌঁছে নির্দিষ্ট সময়ে মহাদেবের পূজা করে বেরিয়ে এসে রাজাও দেখলেন, সমুদ্রের নীল পানি থেকে সোনার গাছ উঠে এল, আর ডালে বসে সুন্দরী একটা মেয়ে বীণা বাজিয়ে গান গাইতে লাগল। রাজা মেয়েটির রূপ দেখে ও তার গান শুনে মুগ্ধ হলেন। তারপর পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে গিয়ে সেই গাছে উঠলেন। গাছটি মুহূর্তে তাঁকে নিয়ে পাতালপুরীতে নেমে গেল।

মেয়েটি রাজাকে বলল, তুমি তো খুব সাহসী লোক। তুমি কে? কীজন্য এখানে এসেছ?

রাজা বললেন, আমি পুণ্যপুরের রাজা; আমার নাম বল্লভ। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই?

মেয়েটি বলল, আমি তোমার সাহস দেখে মুগ্ধ হয়েছি। বিয়ে আমি তোমাকে করতে পারি, তবে এক শর্তে। সারাবছরে কৃষ্ণ চতুর্দশীতে আমার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখতে পারবে না।

রাজা তাতে সম্মত হলেন। তারপর গান্ধর্বমতে দুজনের বিয়ে হলো। রাজা নতুন রানীকে নিয়ে পরম সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

তারপর যথাসময়ে কৃষ্ণ চতুর্দশী এল। রানী রাজাকে অনেক অনুনয় করে তাঁর কাছে থাকতে নিষেধ করল। রাজাও কথামত অন্য জায়গায় চলে গেলেন। কিন্তু তাঁর কৌতূহল হলো, রানী কীজন্য তাঁকে কাছে থাকতে নিষেধ করল? রাজা আড়ালে লুকিয়ে সব দেখতে লাগলেন।

মাঝরাতে ভয়ংকর এক রাক্ষস এসে রানীকে ধরল। দেখে রাজা প্রচণ্ড রাগে আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে খড়গের এক কোপে রাক্ষসের মাথা কেটে ফেললেন।

রাক্ষস মারা যাওয়া রানীর মনে আনন্দ আর ধরে না। রাজাকে বলতে লাগল, তুমি আজ আমাকে রক্ষা করলে। এতকাল আমি কী যে যন্ত্রণা ভোগ করেছি তা আর বলার নয়!

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, কিজন্য তোমাকে এমন কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে?

রানী বলল, আমি গন্ধর্বরাজের মেয়ে। আমার বাবার নাম বিদ্যাধর। আমার নাম রত্নমঞ্জরী। আমি সামনে বসে না থাকলে বাবার খাওয়া হত না। তাই আমি রোজ তার খাবার সময় সামনে থাকতাম। কিন্তু একদিন বাবা খেতে বসলে আমি খেলায় মগ্ন থেকে তার সামনে থাকার কথা ভুলে গেলাম। তারও খাওয়া হলো না। তখন বাবা রাগে আমাকে অভিশাপ দিল, তুই আজ থেকে রসাতলে বাস করবি, আর, কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে এক রাক্ষস এসে তোকে অনেক যন্ত্রণা দেবে। শুনে আমার খুব কষ্ট হলো। আমি তার পায়ে ধরে অনেক কাঁদলাম। বললাম, আমার শাপমোচনের উপায় করে দিন। তখন বাবা বলল, ঠিক আছে, একজন মহাবীর এসে তোকে উদ্ধার করবে। মহারাজ! এতদিন আমি সেই অভিশাপের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিলাম। তুমি এসে আমাকে উদ্ধার করলে। এখন অনুমতি দাও, আমি বাবার কাছে যাই।

রাজা বললেন, আমি যদি তোমার উপকারই করে থাকি; তাহলে বাবার কাছে যাবার আগে আমার রাজধানীতে চলো।

রত্নমঞ্জরী সম্মত হয়ে রাজার সঙ্গে রাজধানীতে গেল। সেখানে কিছুদিন থাকার পর রত্নমঞ্জরী বলল, মানুষের সঙ্গে এতকাল বাস করে আমার গন্ধর্বের স্বভাব নষ্ট হয়েছে, আমি মানুষের মতো হয়ে গেছি। বাবার কাছে গেলে এখন আর সেরকম আদর পাব না। তাই আর আমার যাওয়া হবে না, আমি তোমার কাছেই থাকব।

রানীর কথা শুনে রাজা খুব খুশি হলেন। তিনি আবার রাজকার্য ছেড়ে রানীর সঙ্গে অন্তঃপুরে কাটাতে লাগলেন। আর সত্যপ্রকাশ প্রাণত্যাগ করল।

গল্পের শেষে বেতাল জিজ্ঞেস করল, মহারাজ! কী কারণে সত্যপ্রকাশ প্রাণত্যাগ করল?

রাজা বললেন, সত্যপ্রকাশ দেখল, রাজা রাজকার্য জলাঞ্জলি দিয়েছেন। প্রজারা অনাথ হয়েছে। রাজাকে কেউ সম্মান করবে না। আর রাজাকে সম্মান না করলে আমাকেও কেউ আগের মতো শ্রদ্ধাভক্তি করবে না—দিনরাত এই দুশ্চিন্তায় সে মারা গেছে।

এ-কথা শুনে বেতাল ইত্যাদি।

দ্বাদশ গল্প

বেতাল বলল, মহারাজ! চূড়াপুরে দেবস্বামী নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল। সে যেমন বিদ্বান তেমন রূপবান, আর তেমনই ধনী ছিল। তার স্ত্রীর নাম ছিল লাবণ্যবতী। তার মতো সুন্দরী ত্রিভুবনে ছিল না। তারা স্বামী-স্ত্রীতে পরম সুখেই দিন কাটাচ্ছিল।

তখন গ্রীষ্মকাল। একদিন রাতে খুব গরম পড়াতে তারা দুজনে বাড়ির ছাদে ঘুমোচ্ছিল। সেই সময় এক গন্ধর্ব বিমানে চড়ে আকাশপথে বেড়ানোর সময় সুন্দরী লাবণ্যবতীকে দেখে ঘুমন্ত অবস্থাতেই তাকে বিমানে তুলে নিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর ব্রাহ্মণের ঘুম ভাঙলে তার পাশে লাবণ্যবতীকে না দেখে খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোথাও তাকে পেল না। তখন মন খারাপ করে রাত ভোরের আশায় বসে রইল।

পরদিন সকাল হলে ব্রাহ্মণ আবার লাবণ্যবতীকে অনেক খুঁজল। কিন্তু সবই বৃথা। স্ত্রীকে না পেয়ে সে মনের দুঃখে সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

একদিন দুপুর বেলা দেবস্বামী খিদেয় কাতর হয়ে আরেক ব্রাহ্মণের বাড়িতে গিয়ে বলল, আমার খুব খিদে পেয়েছে। আমাকে কিছু খেতে দিন।

ব্রাহ্মণ দেবস্বামীকে এক বাটি দুধ খেতে দিল। কিন্তু দেবস্বামীর কপাল খারাপ, একটু আগে একটা কালসাপ এসে ওই দুধে মুখ দেয়ায় দুধ বিষাক্ত হয়ে ছিল। তাই দুধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেবস্বামীর শরীর অবশ হয়ে এল। সে ব্রাহ্মণকে বলল, তুমি বিষ খাওয়াইয়া ব্রহ্মহত্যা করলে এই বলে সে মাটিতে ঢলে পড়ে মরে গেল।

এই কাণ্ড দেখে গৃহস্থ ব্রাহ্মণও খুব দুঃখ পেল। সে বাড়ির ভিতর গিয়ে স্ত্রীকে বলল, তুই দুধে বিষ মিশিয়ে রেখেছিলি; সেজন্যই আজ ব্রহ্মহত্যা হলো। তোর মতো পাপিষ্ঠার মুখ আমি আর দেখতে চাই না। তুই আমার বাড়ি থেকে দূর হয়ে যা। বলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে তাড়িয়ে দিল।

গল্প শেষ করে বেতাল জিজ্ঞেস করল, মহারাজ! এক্ষেত্রে দোষী কে?

রাজা বললেন, কালসাপ দোষী হতে পারে না; কারণ, তার মুখে বিষ থাকবেই। ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী জানত না যে দুধে বিষ আছে। অতিথির কোনও দোষ নেই; কারণ সে-ও না জেনে দুধ খেয়েছিল। কিন্তু গৃহস্থ ব্রাহ্মণ কোনো কথা না জেনে, কোনো রকম বিচার-বিবেচনা না করে স্ত্রীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে অন্যায় করেছে। তাই তাকেই আমি দোষী সাব্যস্ত করব।

এ-কথা শুনে বেতাল ইত্যাদি।

ত্রয়োদশ গল্প

বেতাল বলল, মহারাজ! চন্দ্রহৃদয় নগরে রণধীর নামে এক প্রবলপ্রতাপ রাজা ছিলেন। প্রজারা তাঁর রাজত্বে নিরাপদে বাস করত। কিন্তু একবার নগরে ভয়ানক চুরি আরম্ভ হলো। নগরবাসী চোরের অত্যাচারে অস্থির হয়ে উঠল। আর কোনো উপায় না দেখে শেষে তারা দল বেঁধে রাজার কাছে গিয়ে নিজেদের দুঃখের কথা জানাল। রাজা সবাইকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, যা হওয়ার তা হয়েছে। আর যাতে চুরি না হয়, তার ব্যবস্থা করছি। তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে যাও।

প্রজারা রাজার কথা শুনে নিশ্চিন্তমনে ঘরে গেল। রাজাও নগরের চারপাশে নতুন প্রহরী বসিয়ে আদেশ দিয়ে দিলেন, চোরকে ধরতে পারলেই শূলে দেবে। ফল তো হলোই না, চুরি আরও বেড়ে গেল। আবার নগরবাসী রাজার কাছে এসে নালিশ করল।

রাজা বললেন, আচ্ছা আজ রাতে আমি নিজেই নগরে পাহারা দেব। তোমরা বাড়ি যাও।

নগরবাসী রাজার কথায় আশ্বস্ত হয়ে বাড়ি চলে গেল।

তারপর সন্ধ্যা হলে রাজা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ছদ্মবেশে নগর রক্ষা করতে বেরোলেন। রাজা একা চলেছেন। কিছুদূর গিয়ে দেখলেন, একজন অপরিচিত লোক আসছে। তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? তোমার বাড়ি কোথায়? কোথায় যাচ্ছ?

লোকটি জবাব দিল, আমি চোর; কিন্তু তুমি কে? কীজন্য আমার পরিচয় জানতে চাইছ?

রাজা বললেন, আমিও চোর।

শুনে লোকটি খুশি হয়ে বলল, চলো দুজনে একসঙ্গে চুরি করতে যাই।

রাজা চোরের কথায় রাজি হলেন। চোর রাজাকে সঙ্গে নিয়ে এক ধনীর বাড়ি থেকে অনেক ধনদৌলত চুরি করল। তারপর কিছুদূরে গিয়ে এক সুড়ঙ্গ দিয়ে পাতালে নামল। সেখানে পাতালপুরীতে আরেক নগরী। চোর সেই নগরীর এক বাড়িতে বাস করে। সে রাজাকে ঘরের দরজায় বসিয়ে ভিতরে চলে গেল। রাজা একা বসে আছেন। এ সময় এক দাসী এসে রাজার পরিচয় জানতে চাইল। সব শুনে বলল, আপনি কেন এই ভয়ংকর ডাকাতের বাড়িতে এলেন? সে এসে পড়ার আগেই পালান। সে এসে আপনার আসল পরিচয় জানতে পারলে আপনাকে মেরে ফেলবে।

দাসীর কথা শুনে রাজার মনে ভয় হলো; বললেন, আমি তো পথ চিনি না। তুমি যদি দয়া করে পালানোর পথ দেখিয়ে দাও, আমার প্রাণরক্ষা হয়।

www.alorpathsala.org

দাসী তখন রাজাকে পথ দেখিয়ে দিল; রাজাও সেই পথে পালিয়ে রাজবাড়িতে ফিরে এলেন।

পরদিন সকাল হলে রাজা বহু সৈন্যসামন্ত নিয়ে সুড়ঙ্গপথে নেমে চোরের বাড়ি আক্রমণ করলেন। সেই পাতালপুরী রক্ষার দায়িত্ব ছিল এক রাক্ষসের ওপর। রাজার এত এত সৈন্য দেখে চোর বুঝল, তার আর রক্ষা নেই। তখন সে রাক্ষসের শরণাপন্ন হলো। রাক্ষস চোরকে অভয় দিয়ে বলল, তোমার কোনও ভয় নেই; আমি এখনই রাজার সব সৈন্য ধ্বংস করব।

রাক্ষস মহাবিক্রমে রাজার সৈন্যদেরকে আক্রমণ করল; সামনে হাতি, ঘোড়া, মানুষ যা পেল ধরে ধরে গিলতে লাগল। রাক্ষস রাজার প্রায় সব সৈন্যই খেয়ে ফেলল। বাকি যারা ছিল, তারা যে যেদিকে পারল প্রাণভয়ে পালাতে লাগল। রাজাও দেখলেন, না পালালে প্রাণে বাঁচবেন না। তিনিও পালানোর চেষ্টা করলেন।

এদিকে রাক্ষসকে দলে পেয়ে চোরের সাহস বেড়ে গেল। সে রাজার পিছনে ছুটতে ছুটতে বলতে লাগল, ওরে কাপুরুষ। তোকে ধিক্। ক্ষত্রিয়রা কখনও যুদ্ধে পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করে না। তুই ক্ষত্রিয় কুলের কুলাঙ্গার। রাজা হয়েও পালাচ্ছিস। লোকে শুনলে তোর মুখে থুতু দেবে।

চোরের ধিক্কারে রাজা খুব অপমান বোধ করল। সত্যিই তো তিনি রাজা ও ক্ষত্রিয়ের সন্তান। খড়গ হাতে তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। চোরের সঙ্গে তার ঘোরতর যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে চোর পরাস্ত হলো। রাজা তাকে বেঁধে রাজধানীতে নিয়ে এলেন।

পরদিন সকালে রাজা আদেশ দিলেন, চোরকে গাধায় চড়িয়ে সারা নগরের পথে পথে ঘুরিয়ে এনে তারপর শূলে দাও!

রাজার আদেশে প্রহরী চোরকে গাধার পিঠে চড়িয়ে নগরের পথে পথে ঘোরাতে লাগল। চোর সবার ক্ষতি করেছিল। এজন্য তার দুর্দশায় নগরের লোক সবাই খুশি। কিন্তু ধর্মধ্বজ নামে এক বণিকের বাড়ির সামনে এলে বণিকের মেয়ে শোভনা চোরকে জানালা দিয়ে দেখে মুগ্ধ হলো। সে ছুটে গিয়ে তার বাবাকে বলল, বাবা! চোরকে বাঁচাও! আমি তাকে ভালবেসে ফেলেছি!

ধর্মধ্বজ শোভনার কথা শুনে অবাক হয়ে বলল, তা কী করে হয়? চোর এখানে সবার ক্ষতি করেছে; কত লোককে পথে বসিয়েছে, তার কারণে রাজার অনেক সৈন্য মারা গেছে। রাজা একে ছাড়বেন না।

শোভনা বলল, তুমি যেমন করে পারো রাজার কাছে গিয়ে একে ছাড়িয়ে আনো। না হলে আমি আত্মহত্যা করব।

ধর্মধ্বজ মেয়েকে খুব ভালবাসত। সে রাজার কাছে গিয়ে বিনীত হয়ে বলল, মহারাজ! আমার যা কিছু সম্পত্তি আছে, সবই দিচ্ছি, আপনি চোরকে ছেড়ে দিন।

রাজা ধর্মধ্বজের আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন, বললেন, চোর আমার ও নগরবাসীর বিস্তর ক্ষতি করেছে। তাকে আমি ছাড়তে পারি না।

তখন ধর্মধ্বজ বিষণ্নমনে বাড়ি ফিরে মেয়েকে জানাল, মা আমার সব সম্পত্তি দিতে চেয়েছি, কিন্তু রাজা চোরকে ছাড়লেন না।

শোভনার ওই অদ্ভুত বাসনার কথা ততক্ষণে সমস্ত নগরে ছড়িয়ে পড়েছে। বধ্যভূমিতে চোরের কানেও সেকথা গেল। শুনে সে একবার হাসে, একবার কাঁদে। রাজার লোকেরা তাকে শূলে চড়িয়ে মারল।

এই সংবাদ শোভনা শুনলে সে মনে মনে চোরকে স্বামী হিসেবে বরণ করে সহমরণের জন্য বধ্যভূমিতে এসে হাজির হলো। চিতা সাজানো হলো; শোভনা চোরের পাশে চিতায় উঠে বসল, চিতায় আগুন দেয়া হলো। কাছেই ছিল কাত্যায়নী দেবীর মন্দির। দেবী সশরীরে হাজির হয়ে শোভনাকে বললেন, শোনো মেয়ে, তোমার সাহস ও সতীত্ব দেখে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। বর প্রার্থনা করো।

শোভনা বলল, মা, যদি প্রসন্ন হয়ে থাকো, তবে এই চোরকে বাঁচিয়ে দাও।

দেবী তথাস্তু বলে চোরকে বাঁচিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হলেন।

গল্প শেষ করে বেতাল জিজ্ঞেস করল, মহারাজ! চোর কীজন্য প্রথমে হেসেছিল ও পরে কেঁদেছিল?

রাজা বললেন, আমি মরতে যাচ্ছি জেনেও মেয়েটি আমাকে ভালবেসেছে ভেবে চোর প্রথমে হেসেছিল। আমার জন্য রাজাকে তার সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু বিনিময়ে আমি তাকে কিছুই দিতে পারতাম না, এই ভেবে চোর কেঁদেছিল।

এ-কথা শুনে বেতাল ইত্যাদি।

চতুর্দশ গল্প

বেতাল বলল, মহারাজ! কুসমবতী নগরে সুবিচার নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর পরমাসুন্দরী নামে এক কন্যা ছিল। মেয়েটির নাম চন্দ্রপ্রভা। বসন্ত কালে একদিন চন্দ্রপ্রভা তার সখিদের সঙ্গে উপবনে বেড়াতে গেল। সেসময় এক সুপুরুষ ব্রাহ্মণযুবক পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ওই উপবনের একধারে একটা

গাছের ছায়ায় ঘুমোচ্ছিল। চন্দ্রপ্রভা সখিদের নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে সেখানে গিয়ে হাজির হলো। তাদের পায়ের শব্দে ব্রাহ্মণযুবকের ঘুম ভেঙে গেল। সে চোখ মেলে রাজকন্যাকে দেখে আর চোখ ফিরাতে পারে না; রাজকন্যাও তার দিকে তাকিয়ে হতবাক। সখিরাও কাণ্ড দেখে হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে রইল। শেষে তারা রাজকন্যাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি রাজবাড়িতে ফিরে গেল। ব্রাহ্মণযুবক মনস্বী রাজকুমারীকে দেখে এতটাই মজল, তার দেহ অসাড় হয়ে গেল, সে সেখানে মরার মতো পড়ে রইল।

সেসময় ভূদেব ও শশী নামে দুই ব্রাহ্মণ কামরূপে বিদ্যা শিখে বহুদিন পর বাড়ি ফিরছিল। পথশ্রমে ও রৌদ্রে দুজনই বড় ক্লান্ত। তারাও বিশ্রাম করার জন্য ওই উপবনে গাছের ছায়ায় বসতে গিয়ে দেখল সেখানে এক ব্রাহ্মণযুবক বেহুঁশের মতো পড়ে আছে। দেখে দুজনেই আশ্চর্য হলো। তখন তারা অনেক চেষ্টায় মনস্বীর চৈতন্য ফিরিয়ে এনে তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কে? কী করে তোমার এমন অবস্থা হলো?

মনস্বী জবাব দিল, যে আমার দুঃখ দূর করতে পারবে আমি কেবল তার কাছেই আমার মনের কথা বলব। অন্য লোকের কাছে বলে লাভ কী?

ভূদেব বলল, আমাকে তোমার দুঃখের কথা বলো। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, নিশ্চয়ই তোমার দুঃখ দূর করব।

তখন মনস্বী বলল, কিছুক্ষণ আগে আমি অপরূপ সুন্দরী এক রাজকন্যাকে দেখেছি। কিন্তু দেখা দিয়েই হঠাৎ করে সে যেন কোথায় চলে গেছে। আমি তাকে বিয়ে করতে না পারলে আত্মহত্যা করব।

শুনে ভূদেব হেসে বলল, আমি নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে তার মিলন ঘটিয়ে দেব। বলে সে মনস্বীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল।

সেখানে গিয়ে ভূদেব মনস্বীকে বলল, আমি তোমাকে একটা মন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি। মন্ত্রটি জপ করলে তুমি ষোল বছরের মেয়ে হয়ে যাবে, আবার যখন ইচ্ছে হবে নিজের রূপে ফিরে আসতে পারবে।

মনস্বী ভূদেবের কাছ থেকে মন্ত্রটি শিখে জপ করতেই ষোল বছরের মেয়ে হয়ে গেল। ভূদেবও আশি বছরের বৃদ্ধ সেজে মনস্বীকে বধূ সাজিয়ে রাজসভায় গিয়ে উপস্থিত হলো।

রাজা সুবিচার বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখে খুব সম্মান করে তাকে বসতে আসন দিলেন। ভূদেব রাজাকে আশীর্বাদ করলে রাজা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ঠাকুর! আপনি কোথা থেকে এসেছেন?

ভূদেব বলল, আমি গঙ্গার পূর্বপার থেকে এসেছি। সঙ্গে যে মেয়েটিকে দেখছেন, সে আমার পুত্রবধূ! একে বাপের বাড়ি থেকে আনতে গিয়েছিলাম। বাড়ি ফিরে দেখি, গ্রামে মহামারী শুরু হয়েছে, রোগের ভয়ে

গ্রামের সকলে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। বাড়িতে আমার জোয়ান ছেলে ও ব্রাহ্মণী ছিল। তারাও চলে গেছে। কোথায় গেলে যে তাদের সন্ধান পাব জানি না। তাদের দেখা না পেলে আমি মরে যাব। এখন আমার এই পুত্রবধূকে বিশ্বাসী কারও কাছে রেখে তাদের সন্ধানে বের হব বলে ঠিক করেছি। আপনি রাজা, আপনার মতো বিশ্বাসী আর কে আছে? আমি যতদিন না ফিরে আসি, আপনি আমার এই পুত্রবধূটিকে আপনার কাছে রাখুন!

ব্রাহ্মণের কথা শুনে রাজা ভাবলেন, ভাল মুশকিলে পড়লাম। পরের মেয়েকে ঘরে রাখাও বিপদ, আবার না রাখলেও ব্রাহ্মণ চটে যাবে। তবে এক কাজ করা যেতে পারে। এটাকে আমার মেয়ে চন্দ্রাপ্রভার কাছে রেখে দিতে পারি; তাহলে সব দিক বজায় থাকবে। মনস্থির করে নিয়ে রাজা ব্রাহ্মণকে বললেন, ঠাকুর! আপনি যা হুকুম করেছেন, তা-ই হবে।

রাজার কথা শুনে ব্রাহ্মণ তার পুত্রবধূরূপী মনস্বীকে রেখে, রাজাকে আশীর্বাদ করতে করতে চলে গেল। রাজাও অন্তঃপুরে গিয়ে রাজকুমারী চন্দ্রপ্রভার হাতে মেয়েটির ভার দিয়ে এলেন।

মেয়েটি চন্দ্রপ্রভার সমবয়সী; দেখতেও সুন্দর। দুজনের ভাব হতে দেরি হলো না। দুজনে একসঙ্গে থাকে, একসঙ্গে খায়, একসঙ্গে বেড়ায়। রাজকন্যা একদণ্ডও মেয়েটিকে ছেড়ে থাকতে পারে না। একদিন সে রাজকন্যার মনের ভাব পরীক্ষার জন্য জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা ভাই। সবসময় তুমি কী ভাবো বলো তো? প্রায়ই তোমার মুখ মলিন দেখি কেন?

রাজকন্যা বলল, ভাই! বসন্তকালে একদিন সখিদের সঙ্গে উপবনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে এক ব্রাহ্মণযুবককে দেখেছি। তার রূপের তুলনা হয় না। তার কথা কিছুতে ভুলতে পারি না। কিন্তু সে কে, কোথায় বাস, কী নাম, কিছুই জানি না। লজ্জায় এ-সব কথা কারও কাছে বলতেও পারি না। তুমি জিজ্ঞেস করলে তাই তোমাকে বললাম। তুমি কাউকে বলে দিও না।

রাজকন্যার কথা শুনে মনস্বী খুব খুশি। সে বলল, সখি, আমি যদি সেই ব্রাহ্মণযুবককে তোমার সামনে এনে দিতে পারি তবে আমায় কী দেবে?

রাজকন্যা বলল, আমি তোমার দাসী হয়ে থাকব।

তখন মনস্বী তার নিজের রূপ ধারণ করল।

এমন অদ্ভুত ব্যাপার দেখে রাজকন্যা প্রথমে খুব আশ্চর্য হলো। কিছুক্ষণ মনস্বীর দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কী করে এতদিন মেয়ে সেজে ছিলে, আবার কী করেই-বা নিজের রূপ ধরলে?

তখন মনস্বী সেই উপবনে রাজকন্যাকে দেখার পর থেকে যা যা ঘটেছিল, সব বলল। শুনে রাজকন্যা খুব খুশি। তারপর দুজনের গান্ধর্বমতে বিয়ে হলো। রাজকন্যা মনস্বীকে অন্তঃপুরেই রেখে দিল।

তারপর থেকে দুজনেই পরম সুখে দিন কাটাতে লাগল। মনস্বী মেয়ের বেশ ধরে রাজকন্যার কাছে থাকে। সকলেই জানে সে সেই বুড়ো ব্রাহ্মণের পুত্রবধূ। একদিন রাজা সুবিচার সপরিবারে মন্ত্রীর বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলেন। মন্ত্রীপুত্র ব্রাহ্মণের পুত্রবধূরূপী মনস্বীকে দেখে তার প্রেমে পড়ে গেল। এমনই অবস্থা, ওই মেয়েকে না পেলে সে প্রাণ বিসর্জন দেয়। মন্ত্রী আর কোনো উপায় না দেখে রাজাকে সব কথা খুলে বলল। রাজা পড়লেন মহাবিপদে। অন্যের স্ত্রীকে আরেক পাত্রের কাছে বিয়ে দেয়া শাস্ত্রসম্মত নয়। এদিকে ব্রাহ্মণও সেই যে মেয়েটাকে রেখে চলে গেছে, তারও আর দেখা নেই। শেষে রাজা মেয়েরূপী মনস্বীর কাছে গিয়ে তার অনুগ্রহ প্রার্থনা করলেন। মনস্বী রেগে গিয়ে রাজাকে বলল, আপনি রাজা হয়ে একের স্ত্রীকে আরেকজনের হাতে দেয়ার মতো অন্যায় করতে চাইছেন। রাজা তখনকার মতো সেখান থেকে চলে গেলেও মনস্বী বুঝল, বেশিদিন আর রাজার অন্তঃপুরে তার থাকা চলবে না। পালানো ছাড়া উপায় নেই। সে তখন পালিয়ে গিয়ে ভূদেবের বাড়িতে উঠল, তাকে সব কথা জানাল।

এদিকে রাজা সুবিচার যখন শুনলেন, ব্রাহ্মণের পুত্রবধূকে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন মনে মনে শঙ্কিত হলেন; ভাবলেন, সর্বনাশ! সেই বুড়ো ব্রাহ্মণ এসে এখন তার পুত্রবধূকে চাইলে, কী জবাব দেব? পুত্রবধূকে না পেলে শাপ দিয়ে আমার সর্বনাশ করবে! সমস্ত দোষ আমার। তাকে যদি মন্ত্রীপুত্রকে বিয়ে করতে চাপ না দিতাম তাহলে সে পালাত না।

ওদিকে ভূদেব কামরূপে গিয়ে শিক্ষা নেয়া আরেক ব্রাহ্মণ শশীকে তার বিশ বছর বয়েসী পুত্র সাজিয়ে, নিজে আগের সেই বুড়ো ব্রাহ্মণের বেশ ধরে রাজসভায় গিয়ে উপস্থিত। তাকে দেখেই রাজা ভয়ে অস্থির। ব্যস্ত হয়ে তাকে বসতে আসন দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মহাশয়ের ফিরতে এত দেরি হলো কেন?

ভূদেব বলল, মহারাজ! অনেক খুঁজে আমার ছেলেকে পেয়েছি। সেজন্য ফিরতে দেরি হলো। যা হোক এখন পুত্রবধূকে নিয়ে ঘরে যাব।

তখন রাজা ব্রহ্মশাপের ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জোড়হাতে বুড়ো ব্রাহ্মণকে সব কথা খুলে বলল।

শুনে ব্রাহ্মণ রাগে এমন কাঁপতে লাগল; যেন তখুনি শাপ দেয়।

রাজা বিনীতভাবে বললেন, মহাশয়! আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার ক্ষতিপূরণের জন্য যা বলবেন, তাই করব।

৭৫২৫৩১৭

ভূদেব বলল, যদি আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার এই ছেলের বিয়ে দেন, তাহলে ক্ষমা করতে পারি।

রাজা তাতেই সম্মত হয়ে বুড়োর ছেলের সঙ্গে তার মেয়ে চন্দ্রপ্রভার বিয়ে দিলেন। বিয়ের পর ভূদেব ছেলে ও বউকে নিয়ে বাড়ি গেল। কিন্তু সেখানে গিয়েই শশী ও মনস্বী রাজকন্যাকে নিয়ে ঝগড়া শুরু করল। শশী বলে, এ আমার স্ত্রী! মনস্বী বলে, এ আমার স্ত্রী।

গল্পের পর বেতাল জিজ্ঞেস করল, মহারাজ! শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে রাজকন্যা কার স্ত্রী বলুন।

রাজা বললেন, মনস্বীর। কেননা তার সঙ্গেই গান্ধর্বমতে রাজকন্যার বিয়ে হয়েছিল। রাজা শশীর সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দিলেও তা সিদ্ধ হয় না।

এ-কথা শুনে বেতাল ইত্যাদি।

পঞ্চদশ গল্প

বেতাল বলল, মহারাজ! হিমালয় পর্বতের গায়ে পুষ্পসার নামে এক সুন্দর নগর ছিল। ওই নগরে গন্ধর্বরাজ জীমূতকেতু রাজত্ব করতেন। কল্পবৃক্ষের পূজা করে তার বরে রাজা জীমূতকেতুর একটা পুত্র জন্মে। রাজা পুত্রটির নাম রাখেন জীমূতবাহন। জীমূতবাহন বড় শান্ত ও সুশীল ছিল। শিক্ষায় তার এমন মনোযোগ ছিল যে, অল্পকালের মধ্যেই সব শাস্ত্রে পণ্ডিত ও একজন নিপুণ যোদ্ধা হয়ে উঠল।

কিছুদিন পরে রাজা আবার কল্পবৃক্ষের পূজা করে তার কাছে বর চাইলেন, আমার প্রজারা খুব ধনী হোক। কল্পবৃক্ষ তাঁর প্রার্থনা পূরণ করল। প্রজারা দিন দিন ধনী হয়ে উঠল। শেষে এমন হলো যে, ধনে অহঙ্কারে রাজাকেও তারা তুচ্ছজ্ঞান করতে লাগল। রাজার কিন্তু কোনদিকে মনোযোগ নেই; তিনি রাতদিন ধর্মচিন্তায় বিভোর। সুযোগ বুঝে রাজার জ্ঞাতিরা বিদ্রোহী হলো। তারা একদিন অনেক সৈন্যসামন্ত নিয়ে রাজবাড়ি ঘিরে ফেলল।

এই ব্যাপার দেখে যুবরাজ জীমূতবাহন পিতাকে বলল, মহারাজ! আপনি হুকুম দিলে আমি এখনই যুদ্ধ করে সবাইকে পরাস্ত করি ও বিদ্রোহীদের শাস্তি দিই।

জীমূতকেতু পুত্রকে নিষেধ করলেন; বললেন, বাবা! জীবন কবে আছে কবে নেই। বিষয়-আশয়ও নিতান্ত তুচ্ছ। এর জন্য মারামারি কাটাকাটির দরকার নেই। চলো, এ-সব ছেড়ে নির্জন কোথাও গিয়ে ভগবানের আরাধনা করি।

www.alorpathsala.org

তারপর রাজা পুত্র জীমূতবাহনকে নিয়ে মলয়-পর্বতে চলে গেলেন। সেখানে কুঁড়েঘর বেঁধে ভগবানের আরাধনা করতে লাগলেন।

সেখানে এক ঋষিকুমারের সঙ্গে জীমূতবাহনের বন্ধুত্ব হলো। একদিন দুই বন্ধুতে বেড়াতে বেরিয়েছেন। কিছুদূরে কাত্যায়নী দেবীর মন্দির। সেখান থেকে মধুর বীণার শব্দ শুনতে পেয়ে তাদের কৌতূহল হলো। তারা সেখানে গিয়ে দেখল, একটা পরমাসুন্দরী মেয়ে দেবীর সামনে বসে বীণা বাজিয়ে গান করছে। দুজনে বসে তা শুনতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর গান শেষ করে মেয়েটি জীমূতবাহনকে দেখতে পেল। রাজকুমারের সুন্দর চেহারা দেখে সে তাকে ভালবেসে ফেলল ও সখিকে দিয়ে তার পরিচয় নিয়ে বাড়ি চলে গেল।

ওই মেয়ে রাজা মলয়কেতুর মেয়ে মলয়বতী। সে বাড়ি গিয়ে সখিকে দিয়ে মাকে সব জানাল। মা তখন রাজা মলয়কেতুকে জানালেন। রাজা মলয়কেতু তার পুত্র মিত্রাবসুকে বললেন, তোমার বোনের বিয়ের বয়স হয়েছে। এখন একে উপযুক্ত পাত্রের হাতে দেওয়া দরকার। শুনলাম, রাজা জীমূতকেতু তাঁর পুত্র জীমূতবাহনকে নিয়ে মলয় পর্বতে বাস করছেন। আমার ইচ্ছে জীমূতবাহনের সঙ্গে তোমার বোনের বিয়ে দিই। তুমি তার কাছে গিয়ে আমার ইচ্ছে জানাও।

পিতার হুকুমে মিত্রাবসু জীমূতকেতুর কাছে গিয়ে সব কথা জানাল। রাজা জীমূতকেতু তাতে রাজি হয়ে জীমূতবাহনকে মিত্রাবসুর সঙ্গে মলয়কেতুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। রাজবাড়িতে জীমূতবাহন ও মলয়বতীর বিয়ে হলো। তারপর দুজনে মহাসুখে দিন কাটাতে লাগল।

একদিন জীমূতবাহন ও মিত্রাবসু মলয় পর্বতে বেড়াতে বেরোল। পর্বতের উত্তর দিকে এক জায়গায় স্তূপ হয়ে থাকা সাদা জিনিস দেখতে পেয়ে জীমূতবাহন মিত্রাবসুকে জিজ্ঞেস করল, বন্ধু, ওখানে ওই সাদা জিনিসগুলো কী?

মিত্রাবসু বলল, নাগের হাড়। আগে নাগ ও গরুড়ে যুদ্ধ লেগেই থাকত। শেষে নাগেরা পরাস্ত হয়ে গরুড়ের সঙ্গে সন্ধি করতে চাইলে গরুড় বলল, তোমরা যদি রোজ তোমাদের একজনকে আমাকে খেতে দাও, তাহলে সন্ধি করতে পারি। নাগেরা তাতে রাজি হলো। সেদিন থেকে প্রতিদিন একজন করে নাগ এসে ওইখানে হাজির থাকে; দুপুরে গরুড় এসে তাকে খায়। নাগের হাড় জমে ওরকম স্তূপ হয়ে আছে।

মিত্রাবসুর কথা শুনে জীমূতবাহনের মনে দয়া হলো। ভাবল, নিশ্চয়ই আজও গরুড়ের জন্য একজন নাগ এসে অপেক্ষা করছে। আমি নিজের প্রাণ দিয়ে তার প্রাণ রক্ষা করব! এই ভেবে রাজপুত্র কৌশলে মিত্রাবসুকে বাড়ি পাঠিয়ে দিল; তারপর সেই হাড়ের পাহাড়ের কাছে গিয়ে দেখল, সেখানে

এক বৃদ্ধা নাগিনী কপাল চাপড়ে বিলাপ করে কাঁদছে। জীমূতবাহন বৃদ্ধার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, মা! তুমি এমন করে কাঁদছ কেন?

বৃদ্ধা বলল, বাবা! আজ আমার একমাত্র ছেলে শঙ্খচূড়কে হারাব। আজ তার পালা। একটু পরেই গরুড় এসে তাকে খেয়ে ফেলবে। সে-জন্য কাঁদছি।

জীমূতবাহন বলল, মা! তুমি আর কেঁদো না। আমি আজ নিজের প্রাণ দিয়ে তোমার ছেলের প্রাণ রক্ষা করব।

বৃদ্ধা বলল, বাবা! তুমি কেন পরের জন্য প্রাণ দিতে যাবে? পরের ছেলের প্রাণ দিয়ে নিজের ছেলেকে বাঁচালে আমার ঘোর অধর্ম হবে।

দুজনে কথাবার্তা হচ্ছে, এমন সময় শঙ্খচূড় এসে হাজির। সে জীমূতবাহনের পরিচয় পেয়ে এবং সব কথা শুনে বলল, আপনার মতো ধার্মিক ও দয়ালু মানুষ পৃথিবীতে খুব কমই আছে। আপনি বেঁচে থাকলে অনেকের উপকার হবে। কিন্তু আমার প্রাণের মূল্য কী? আমার মৃত্যু হলে কারও কোনো ক্ষতি হবে না। আপনি আমার জন্য প্রাণ দেবেন না।

জীমূতবাহন বলল, শোনো শঙ্খচূড়! আমি ক্ষত্রিয়। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, তোমার প্রাণ রক্ষা করব। ক্ষত্রিয়েরা প্রাণের চেয়ে প্রতিজ্ঞাকে বড় করে দেখে। এই বলে রাজা শঙ্খচূড়কে সেখান থেকে বিদায় দিয়ে তার জায়গায় গরুড়ের অপেক্ষায় বসে রইল। শঙ্খচূড় নিতান্ত বিষণ্নমনে সেখান থেকে দেবী কাত্যায়নীর মন্দিরে গিয়ে জীমূতবাহনের প্রাণরক্ষার জন্য প্রার্থনা করতে লাগল।

এদিকে গরুড়ের আসার সময় হলো। আকাশ অন্ধকার করে ভয়ংকর শব্দ করতে করতে গরুড় উড়ে এল। জীমূতবাহন তেমনি বসে আছে। গরুড় জীমূতবাহনকে শঙ্খচূড় ভেবে তাকে ঠোঁটে চেপে ধরে আকাশে উঠে পাক খেতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে আকাশ থেকে জীমূতবাহনের ডান হাতের রক্তমাখা বাজু খসে স্ত্রী মলয়বতীর সামনে পড়ল। বাজুতে জীমূতবাহনের নাম লেখা ছিল। মলয়বতী বাজুটি তুলে নিয়ে তাতে লেখা নাম পড়ে কেঁদে উঠল। রাজা, রানী, রাজকুমারও সেই বাজু দেখে হাহাকার করতে লাগল। জীমূতবাহনের খোঁজে চারপাশে লোক ছুটল।

শঙ্খচূড় এতক্ষণ কাত্যায়নী দেবীর মন্দিরে প্রার্থনা করছিল। রাজবাড়ি থেকে কান্নার শব্দ শুনে সে বুঝল, গরুড় এসে জীমূতবাহনকে তুলে নিয়েছে। সে তাড়াতাড়ি সেই হাড়ের স্তূপের কাছে এসে চিৎকার করে গরুড়কে ডেকে বলতে লাগল, ওহে পক্ষিরাজ! তুমি ভুল করে জীমূতবাহনকে ধরে নিয়ে গেছ। আজ তো তোমার আমাকে খাওয়ার কথা। একে ছেড়ে দিয়ে আমাকে নিয়ে যাও, না হলে তোমার অধর্ম হবে।

শঙ্খচূড়ের কথা শুনে গরুড়ের ভয় হলো। সে মৃতপ্রায় জীমূতবাহনকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কে? কীজন্য নিজের প্রাণ দিতে চাইছ?

জীমূতবাহন নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, মরতে তো একদিন হবেই। আজ মরলে আমার প্রাণের বিনিময়ে যদি আরেকজন বাঁচে, তো তার চেয়ে পুণ্যের কাজ আর কী আছে? সে-জন্য আমি শঙ্খচূড়ের হয়ে প্রাণ দিচ্ছি।

জীমূতবাহনের কথা শুনে গরুড় বলল, আমি তোমার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছি। বর প্রার্থনা করো।

জীমূতবাহন বলল, পক্ষিরাজ। যদি সন্তুষ্ট হয়ে থাকো, তাহলে এই বর দাও, আজ থেকে আর নাগ মারবে না। আর, এতদিন যাদের খেয়েছ, তাদেরও বাঁচিয়ে দাও।

গরুড় তথাস্তু বলে পাতাল থেকে অমৃত এনে, সেই হাড়গুলোর ওপর ছিটিয়ে দিতেই নাগেরা সবাই বেঁচে উঠল। তারপর গরুড় জীমূতবাহনকে বলল, রাজকুমার, তুমি আমার বরে নিজের রাজ্য ফিরে পাবে। এই বলে গরুড় চলে গেল।

জীমূতবাহনের এই কাহিনী তার বিদ্রোগী জ্ঞাতিদের কানে গেলে তারা তার পরোপকারে মুগ্ধ হয়ে রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। সিংহাসনও ছেড়ে দিল।

বেতাল জিজ্ঞেস করল, মহারাজ! শঙ্খচূড় ও জীমূতবাহনের মধ্যে কে বেশি উদার?

রাজা বললেন, শঙ্খচূড় !

বেতাল বলল, জীমূতবাহন এমন ত্যাগ স্বীকার করল, তবুও তার উদারতা শঙ্খচূড়ের চেয়ে কেন কম মনে হচ্ছে আপনার?

রাজা বললেন, জীমূতবাহন ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়েরা প্রাণের মায়া করে না। তা ছাড়া শঙ্খচূড় চায়নি তাকে বাঁচানোর জন্য জীমূতবাহন নিজের জীবন দিক। জীমূতবাহন যখন কোনমতেই তাকে থাকতে দিল না, তখন শঙ্খচূড় জীমূতবাহনের প্রাণরক্ষা করার জন্য কাত্যায়নীর কাছে প্রার্থনা করতে লাগল। সুতরাং আমার মতে শঙ্খচূড়ই বেশি উদার।

এ-কথা শুনে বেতাল ইত্যাদি।

ষোড়শ গল্প

মহারাজ বিক্রমাদিত্য আবার বেতালকে কাঁধে নিয়ে চলতে লাগলেন। কিছুদূর যাবার পর বেতাল বলল, মহারাজ! চন্দ্রশেখর নগরে রত্নদত্ত নামে

এক বণিক ছিল। তার মেয়ের নাম ছিল উন্মাদিনী। উন্মাদিনীর মতো সুন্দরী মেয়ে খুব একটা দেখা যায় না। সে বড় হলে রত্নদত্ত রাজার কাছে গিয়ে নিবেদন করল, মহারাজ! আমার একটা সুন্দরী মেয়ে আছে। আপনার যদি ইচ্ছে হয় তাকে বিয়ে করুন। না হলে আমি অপর কোনো পাত্রের সঙ্গে তার বিয়ে দেব।

মেয়ের বাবার মুখের কথায় মেয়েটি সুন্দরী কি না বিশ্বাস করতে না পেরে রাজা দুজন বয়স্ক কর্মচারীকে মেয়েটির রূপ-গুণ পরীক্ষার জন্য পাঠালেন। তারা রত্নদত্তের বাড়ি গিয়ে দেখল, উন্মাদিনী সত্যিই পরমাসুন্দরী। এমন সুন্দরী ত্রিভুবনের কোথাও নেই। তখন তারা পরামর্শ করল : রাজার কাছে গিয়ে বলা যাক মেয়েটি নিতান্ত কুলক্ষণা ও কুরূপা। এমন সুন্দরী মেয়ে রানী হলে রাজা রাজকার্য জলাঞ্জলি দিয়ে দিনরাত অন্তঃপুরেই পড়ে থাকবেন।

তারা ফিরে গিয়ে রাজাকে জানাল, রত্নদত্তের মেয়েটি কুরূপা ও কুলক্ষণা। রাজা তাদের কথায় বিশ্বাস করে মেয়েটিকে বিয়ে করতে রাজি হলেন না। তখন রত্নদত্ত রাজার সেনাপতি বলভদ্রের সঙ্গে উন্মাদিনীর বিয়ে দিল।

কিছুদিন পরে রাজা একদিন নগরের মধ্যে বেড়াতে বেরিয়ে সেনাপতির বাড়ির কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। উন্মাদিনী তখন বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়েছিল। রাজা তার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এমন সুন্দরী মেয়ে রাজা কখনও দেখেন নি। রাজা অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে ভাবতে রাজবাড়িতে ফিরে এলেন।

তাকে অন্যমনস্ক ও হঠাৎ ফিরতে দেখে রাজার একজন প্রিয় সঙ্গী জিজ্ঞেস করল, মহারাজ! আপনি এত অন্যমনস্ক কেন?

রাজা বললেন, দেখো, সেনাপতি বলভদ্রের বাড়িতে আজ একটা সুন্দরী মেয়ে দেখলাম। আমার ধারণা, তার মতো সুন্দরী ত্রিভুবনে কোথাও নেই।

সঙ্গী বলল, মহারাজ! উনি বণিক রত্নদত্তের মেয়ে। আপনি একে বিয়ে করতে অস্বীকার করায় রত্নদত্ত বলভদ্রের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছে।

রাজা বললেন, তার মানে আমি ওই মেয়েটির রূপ-গুণ পরীক্ষা করতে যাদের পাঠিয়েছিলাম, তারা আমাকে মিথ্যে কথা বলেছে? তারপর রাজা সেই কর্মচারীদের ডেকে এনে বললেন, তোমরা আমার সঙ্গে মিথ্যে কথা বলেছ। রত্নদত্তের মেয়েকে আজ আমি নিজের চোখে দেখেছি। সে অপরূপ সুন্দরী। তোমরা মিথ্যে কথা বলেছিলে কেন?

তারা জবাব দিল, মহারাজ! ওই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হলে আপনি রাজকার্যে মন না দিয়ে কেবল অন্দরেই থাকতেন। তাতে রাজ্যের ক্ষতি হতো। সে-জন্য মিথ্যে বলেছিলাম। মহারাজ, আমাদের ক্ষমা করুন। রাজা

বললেন, তোমরা ঠিকই করেছিলে। আচ্ছা, তোমরা যাও। কিন্তু তখন থেকে রাজা এমন মনের কষ্টে দিন কাটাতে লাগলেন যে, দশম দিনে তার মৃত্যু হলো।

প্রভুভক্ত সেনাপতি বলভদ্র রাজার মৃত্যুসংবাদ শুনে খুব ব্যথিত হলো; ভাবল, এমন প্রভু আমি আর পাব না। ইনিই যখন মারা গেলেন, আমার বেঁচে থেকে লাভ কী? ধরতে গেলে আমার জন্যই রাজার মৃত্যু হলো। তারপর সূর্যদেবের দিকে জোড়হাতে তাকিয়ে বলল, ভগবান সূর্যদেব! তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা, যেন জন্মে জন্মে আমি এমন প্রভু পাই। বলে সে রাজার সঙ্গে জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিল।

তার স্ত্রী উন্মাদিনীও ভাবল, আমারই-বা আর বেঁচে থাকার কী দরকার? বরং স্বামীর সহগমন করলে পুণ্য সঞ্চয় হবে। এই ভেবে সে-ও স্বামীর সাথে সহগমন করল।

গল্প শেষ করে বেতাল জিজ্ঞেস করল, মহারাজ! রাজা, সেনাপতি বলভদ্র ও উন্মাদিনীর মধ্যে কার মহত্ত্ব বেশি?

বিক্রমাদিত্য বলল, অবশ্যই রাজার।

কেন?

রাজা ইচ্ছে করলেই উন্মাদিনীকে রানী করতে পারতেন। কিন্তু অধর্ম ও অপযশের ভয়ে তা করেননি; অথচ উন্মাদিনীর দুঃখে মারা গেলেন। আর প্রভুর জন্য ভৃত্যর প্রাণ দেয়া, স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সহগমন, এগুলো তো স্বাভাবিক। তাই আমার মতে, রাজার মহত্ত্ব বেশি।

এ-কথা শুনে বেতাল ইত্যাদি।

সপ্তদশ গল্প

বেতাল বলল, মহারাজ, শুনুন। হেমকুট নগরে বিষ্ণুশর্মা নামে এক ধার্মিক ব্রাহ্মণ ছিল। তার ছেলের নাম ছিল গুণাকর। গুণাকর বড় হয়ে কেবল পাশা খেলে বেড়াত। খেলতে খেলতে বাবার সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করে ফেলল। তখন বিষ্ণুশর্মা তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল।

গুণাকর তখন পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এমনি করে সে এক নগরের কিনারে গিয়ে পৌছল। সেখানে এক যোগী যোগ সাধনা করছিল। গুণাকর যোগীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে তার সামনে বসল। যোগী গুণাকরের দিকে তাকিয়ে বুঝল, তার খিদে পেয়েছে। সে জিজ্ঞেস করল, তুমি কিছু খাবে?

গুণাকর বলল, আপনার প্রসাদ পেলে নিশ্চয়ই খাব।

যোগী তখন একটা মড়ার মাথায় করে তাকে অন্নব্যঞ্জন দিল। কিন্তু গুণাকর তা খেল না; বলল মহাশয়। এ খাবার খেতে আমার ইচ্ছে করছে না।

যোগী তখন চোখ বুজে যোগাসনে বসতেই এক যক্ষমেয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলো। সে হাতজোড় করে যোগীকে জিজ্ঞেস করল, কী হুকুম?

যোগী বলল, এই বামুন ছেলেটি আমার আশ্রমে আজ অতিথি। সে খুব ক্ষুধার্ত। ব্যবস্থা করো।

যক্ষমেয়ে মায়াবলে নিমেষে সেখানে সুন্দর এক ঘর নির্মাণ করল। তারপর গুণাকরকে তার মধ্যে নিয়ে গিয়ে সুগন্ধি চালের ভাতের সঙ্গে মাছ, মাংস, দই, সন্দেশ এ-সব খাওয়াল। রাতেও গুণাকরের যত্নের ত্রুটি হলো না। গুণাকর মণিময় পালঙ্কে শুয়ে মহাসুখে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে সেসব কিছুই নেই।

সে তখন যোগীর কাছে সব কথা জানাল। যোগী বলল, যোগবলে ওইসব আনা হয়েছিল। যে যোগসাধনে সিদ্ধিলাভ করতে পারে, যক্ষমেয়ে চিরকাল তার হুকুম শোনে।

তখন গুণাকরেরও যোগ শেখার ইচ্ছে হলো। যোগী তার আগ্রহ দেখে তাকে মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে বলল, এই মন্ত্রটি তুমি মাঝরাতে গলা পানিতে দাঁড়িয়ে চল্লিশ দিন জপ করবে।

গুণাকর গুরুর উপদেশে তা-ই করল। তারপর গুরুকে জিজ্ঞেস করল, এখন কী হুকুম?

যোগী বলল, এ মন্ত্রটি আরও চল্লিশ দিন আগুনে দাঁড়িয়ে জপ করলে তুমি সিদ্ধিলাভ করবে।

এদিকে বাবা-মাকে অনেকদিন না দেখে গুণাকরের মন বড় অস্থির হয়ে উঠল। সে বলল, প্রভু! অনেকদিন বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছি। বাবা-মাকে দেখার জন্য মন বড় ব্যাকুল হয়েছে। দিন কয়েকের জন্য তাদের দেখে আসি।

গুরু তাকে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দিল। গুণাকর বাড়ি চলে এল। বাবা-মা বহুদিন পরে ছেলেকে পেয়ে চোখের পানি ধরে রাখতে পারল না।

গুণাকর এতদিন কোথায় ছিল বাবা-মাকে জানিয়ে বলল, আপনাদের জন্য মন বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তাই দেখে গেলাম। এবার বিদায় দিন; আমি যোগসাধন করতে যাব।

বাবা-মা কিছুতেই তাকে ছাড়তে রাজি হলো না। গুণাকর তাদের অনেক বুঝিয়ে আবার গুরুর কাছে ফিরে এল। তারপর তার উপদেশমত আগুনে দাঁড়িয়ে মন্ত্রসাধনা করতে লাগল; তবুও সিদ্ধি লাভ করতে পারল না।

গল্প শেষ করে বেতাল জিজ্ঞেস করল, মহারাজ! কীজন্য গুণাকর সিদ্ধি লাভ করতে পারল না?

রাজা বললেন, একমনে মন্ত্রসাধন না করলে সিদ্ধি লাভ করা যায় না। গুণাকরের মনে একাগ্রতা ছিল না, তাই সে বিফল হয়েছে।

এ-কথা শুনে বেতাল ইত্যাদি।

অষ্টাদশ গল্প

বেতাল বলল, মহারাজ! কুবলয়পুরের বণিক ধনপতি খুব ধনী ছিল। রাজা গৌরীদত্তের সঙ্গে তার মেয়ে ধনবতীর বিয়ে দেয়। কিছুদিন পরে ধনবতীর এক মেয়ে হয়। গৌরীদত্ত তার নাম রাখেন মোহিনী। কিছুদিন পরে গৌরীদত্ত মারা গেলে তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা ধনবতীর সব সম্পত্তি কেড়ে নিল। ফলে ধনবতী আর সেখানে থাকতে না পেরে এক রাতে মেয়েকে নিয়ে বাবার বাড়ি রওনা হলো।

অন্ধকার রাত। দুজনে চলছে। কিছুদূর গিয়ে তারা পথ ভুলে এক শ্মশানে এসে পড়ল। সেখানে কয়েকদিন আগে এক চোরকে শূলে দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু তখন পর্যন্ত তার মৃত্যু হয়নি। চলতে চলতে হঠাৎ ধনবতীর একটা হাত চোরের গায়ে লাগতেই চোর যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল, তুমি কে? আমার এই কষ্টের ওপর আবার কষ্ট দাও!

ধনবতী বলল, আমি না জেনে দোষ করেছি। আমাকে ক্ষমা করো। তারপর সে চোরের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি কে? কি জন্য শ্মশানে থেকে কষ্ট পাচ্ছ?

চোর বলল, আমি জাতে বণিক। চুরির দায়ে আমাকে তিনদিন হলো শূলে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু এখনও আমার মৃত্যু হয় না। কারণ, শিশুকালে গণকেরা বলেছিল, বিয়ে না হলে আমার মৃত্যু হবে না। যদি তুমি আমার সঙ্গে তোমার মেয়েটির বিয়ে দাও, তাহলে আমার এই অসহ্য যন্ত্রণার শেষ হয়। আমি এক জায়গায় অনেক টাকা লুকিয়ে রেখেছি। তুমি আমার কথায় রাজি হলে সেসব তোমায় দিয়ে যাব।

ধনবতী টাকা-পয়সার লোভে চোরের কথায় রাজি হয়ে বলল, তুমি যা বললে, তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু নাতির মুখ দেখার আমার বড় সাধ। তোমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে আমার সে সাধ মিটবে না।

চোর বলল, তুমি এখন আমার সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে দিয়ে আমার এই যন্ত্রণার শেষ করো। তোমার মেয়ে বড় হলে পরে অন্য কারও সঙ্গে ওর বিয়ে দিও। তাহলেই তোমার সাধ মিটবে।

ধনবতী তখন চোরের সঙ্গে মোহিনীর বিয়ে দিল। চোর বলল, এই গ্রামের পশ্চিম সীমায় আমার বাড়ি। বাড়ির পূর্বদিকে এক কুয়ার কাছে একটা বট গাছ দেখতে পাবে। সেই গাছের গোড়ায় টাকাকড়ি পোঁতা আছে। বলেই চোর মারা গেল।

ধনবতী চোরের কথামত বট গাছের গোড়া খুঁড়ে অনেক মোহর ও মণিমুক্তা পেল। তারপর সেখান থেকে বাবার বাড়ি গিয়ে বাবাকে সব জানাল।

সেই দিন থেকে ধনবতী বাবার বাড়িতেই থাকে। চোরের কাছ থেকে ধনরত্ন পেয়ে তারা এখন ধনী, তাদের কোনও দুঃখ নেই। ক্রমে মোহিনী বড় হলো। ধনপতি অনেক খুঁজে পয়সা-কড়ির লোভ দেখিয়ে এক পাত্রের সঙ্গে তার বিয়ে দিল; কিন্তু কয়েক দিন পর পাত্রটি টাকা-কড়ি নিয়ে পালিয়ে গেল।

কিছুদিন পর মোহিনীর এক ছেলে হলো। ষষ্ঠীর দিন রাতে মোহিনী স্বপ্ন দেখল, একজন পুরুষ ষাঁড়ে চড়ে তার সামনে এল। তার দুটো হাত, পাঁচটা মাথা, প্রতি মাথায় তিনটি করে চোখ ও অর্ধচন্দ্র, পিঠে লম্বা জটা ঝুলছে; তার ডান হাতে ত্রিশূল, গলায় সাপের মালা, পরিধানে বাঘছাল, গায়ের রং ধবধবে সাদা; আর বুকে সাদা সাপের পৈতা, গায়ে ভস্ম। সে মোহিনীকে বলল, তোমার ছেলে হয়েছে, এজন্য আমি বড় খুশি। ছেলেটি ক্ষণজন্মা। সে বড় হয়ে পৃথিবীর অধিশ্বর হবে। ওই ছেলেটিকে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রার সঙ্গে একটা পেটিকায় পুরে মধ্যরাতে রাজবাড়ির দরজায় রেখে আসবে। রাজা তাকে নিজের ছেলের মতো পালন করবেন। বলেই পুরুষটি মিলিয়ে গেল। মোহিনীরও ঘুম ভেঙে গেল।

সে তার মায়ের কাছে স্বপ্নের কথা বলল। ধনবতী মহা খুশি। পরদিন যথাসময়ে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রার সঙ্গে ছেলেটিকে পেটিকায় পুরে মাঝরাতে রাজবাড়ির দরজায় রেখে এল। ঠিক সেই সময়ে রাজাও স্বপ্ন দেখছেন, সেই পুরুষটি তার সামনে এসে বলছে, মহারাজ! উঠো! তোমার দরজায় একটা সুলক্ষণ ছেলে পেটিকার মধ্যে করে এসেছে। তাকে প্রতিপালন করো। পরে সে-ই তোমার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবে।

রাজার ঘুম ভেঙে গেল। রাজা তৎক্ষণাৎ রানীকে জাগিয়ে স্বপ্নের কথা বললেন। তারপর দুজনে রাজবাড়ির দরজায় গিয়ে দেখল, সত্যিই পেটিকার মধ্যে একটা সুন্দর ছেলে রয়েছে। রানী সেই ছেলেটিকে বুকে তুলে নিল। তার নাম হলো হরদত্ত।

তারপর দিন যায়। হরদত্ত বড় হতে লাগল। যেমন লেখাপড়ায় তার মনোযোগ, তেমনি যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ। শেষে রাজার মৃত্যু হলে হরদত্ত রাজা হয়ে সমস্ত পৃথিবী জয় করে নিল।

কিছুদিন পরে মহারাজ হরদত্ত তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে গয়াধামে উপস্থিত হলো। সেখানে ফল্গুনদীর তীরে শ্রাদ্ধ করে পিণ্ড দেয়ার উপক্রম করতেই পিণ্ড নিতে নদীর পানি থেকে মানুষের তিনটি হাত বেরিয়ে এল। প্রথম হাতটা চোরের, দ্বিতীয়টা হরদত্তের বাবার, আর তৃতীয়টা তার পালকপিতা রাজার।

কাহিনী শেষ হলো। বেতাল জিজ্ঞেস করল, মহারাজ! বলুন এদের মধ্যে হরদত্তের পিণ্ড পাওয়ার অধিকারী কে?

রাজা বললেন, চোর।

বেতালের প্রশ্ন, অপর দুজনে অধিকারী নয় কেন?

রাজা বললেন, কারণ, রাজা হরদত্তকে পালন করেছিল মাত্র; আর মোহিনীর দ্বিতীয় স্বামী কেবল টাকা-পয়সার লোভেই তাকে বিয়ে করেছিল। নতুবা সে পালাবে কেন?

এ-কথা শুনে বেতাল ইত্যাদি।

ঊনবিংশ গল্প

বেতাল বলল, মহারাজ! চিত্রকূট নগরে রূপদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। একদিন রাজা একা শিকারে বেরোলেন। সারাদিন ঘোড়ায় চড়ে বনে বনে হরিণের সন্ধান করতে করতে শ্রান্ত হয়ে, রাজা এক ঋষির আশ্রমে এসে পড়লেন। সেখানে একটা সুন্দর পুকুর ছিল। রাজা একটা গাছতলায় ঘোড়াটি বেঁধে ছায়ায় বসে বিশ্রাম করছেন।

কিছুক্ষণ পরে ঋষির মেয়ে এসে স্নান করার জন্য পানিতে নামল। রাজা দেখল, মেয়েটি অপরূপ সুন্দরী। মেয়েটিকে বিয়ে করার ইচ্ছে হলো তাঁর। কিন্তু মেয়েটি তাঁর সঙ্গে কোনো কথা বলল না। রাজা অপেক্ষা করতে লাগলেন। মেয়েটি স্নান সেরে আশ্রমের দিকে যেতেই রাজা তাঁর সামনে এসে বললেন, ঋষিকন্যে! আমি রৌদ্রে ও পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে তোমার আশ্রমে বিশ্রামের জন্য এলাম, অথচ তুমি আমার সঙ্গে একটা কথাও বললে না। এটা কি ঠিক হলো?

রাজার কথা শুনে ঋষিমেয়ে তার সামনে দাঁড়াল। এমন সময় ঋষিও ফল, ফুল, কুশ ইত্যাদি সংগ্রহ করে ফিরে এল। রাজা তাকে দেখে নিজের পরিচয় দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। ঋষিও রাজাকে আশীর্বাদ করে বলল, তোমার ইচ্ছে পূর্ণ হোক!

রাজা সুযোগটা কাজে লাগানোর জন্য ঋষিকে বললেন, মহাশয়! চিরকাল শুনেছি ঋষির কথা মিথ্যে হয় না; কিন্তু আমার ইচ্ছে পূরণ হওয়ার তো কোনও লক্ষণ দেখছি না।

ঋষি বলল, নিশ্চয়ই হবে।

রাজা বললেন, আমার ইচ্ছে এই মেয়েটিকে বিয়ে করি।

রাজার কথা শুনে ঋষি মনে মনে রাগ করল; কিন্তু কিছু করার নেই, রাজাকে আশীর্বাদ করে ফেলেছে। তখন রাজার সঙ্গে সেই মেয়েটির বিয়ে দিল। রাজাও আর দেরি করলেন না। নতুন রানীকে নিয়ে রাজধানীতে রওনা হলেন। পথে এক জায়গায় এলে রাত হলো। রাজা-রানী কিছু ফল-মূল খেয়ে একটা গাছের তলায় শুয়ে পড়ল।

গভীর রাতে এক রাক্ষস এসে রাজাকে বলল, আমার খুব খিদে পেয়েছে; তোমার স্ত্রীকে খাব!

রাজা বললেন, তুমি আমার স্ত্রীকে খেয়ো না। তার বদলে যা চাও তাই দেব।

তখন রাক্ষস বলল, তুমি যদি একটা বারো বছরের বামুনের ছেলের মাথা কেটে এনে আমার হাতে দিতে পারো, তাহলে তোমার স্ত্রীকে খাব না।

রাজা তাতেই সম্মত হয়ে বললেন, আজ থেকে সাত দিন পর তুমি আমার রাজধানীতে গেলে যা চাইবে তাই দেব।

রাক্ষস চলে গেল। রাজাও সকাল হলে নতুন রানীকে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন; কিন্তু তার মন দুশ্চিন্তায় ভার হয়ে রইল। মন্ত্রী রাজার দুশ্চিন্তার কারণ জেনে বলল, মহারাজ! আপনি চিন্তা করবেন না; আমি সব ঠিক করে দেব।

রাজা মন্ত্রীর কথায় নিশ্চিত হলেন।

মন্ত্রী একটা মানুষের সমান সোনার প্রতিমা গড়িয়ে সেটাকে নানারকম গহনা পরিয়ে নগরের চৌরাস্তার ওপর রেখে ঘোষণা করে দিল, যে বামুন তার নিজের ছেলেকে বলি দেয়ার জন্য দান করবে, তাকে ওই মূর্তিটি দেয়া হবে।

এক গরিব ব্রাহ্মণের একটা বারো বছর বয়সের ছেলে ছিল। ব্রাহ্মণ খবর শুনে তার ব্রাহ্মণীকে বলল, দেখো, গরিব হয়ে সংসারে বেঁচে থাকা বড় কষ্ট। আজ পর্যন্ত টাকা-পয়সার মুখ দেখলাম না। কেবল দুঃখই ভোগ করছি। এখন টাকা উপায়ের একটা সহজ পথ দেখা যাচ্ছে। যদি ছেলেটাকে দিয়ে প্রতিমাখানি নিয়ে আসি, তাহলে সুখে কাল কাটাতে পারব।

ব্রাহ্মণীও তাতে রাজি হলো। ব্রাহ্মণ ছেলেটিকে দিয়ে প্রতিমা নিয়ে এল। ওদিকে ঠিক সাত দিনের দিন সকালে রাক্ষস এসে উপস্থিত।

তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের ছেলেটিকে বলি দিতে আনা হলো। রাজা তার মাথা কাটার জন্য খড়গ তুলতেই ছেলেটি মাথা নিচু করে মৃদু হাসল। রাজা সেটা লক্ষ না করে ছেলেটির মাথা কেটে রাক্ষসের হাতে দিলেন।

গল্প শেষ করে বেতাল জিজ্ঞেস করল, মহারাজ! মরার সময় লোকে কাঁদে, কিন্তু ছেলেটি হাসল কেন?

রাজা বললেন, বাবা-মা নিজের ছেলেকে লালনপালন করে, আর রাজা বিপদে-আপদে রক্ষা করেন; কিন্তু ছেলেটির বেলায় তার উল্টো হলো। বাবা-মা টাকার লোভে ছেলেকে বিক্রি করল; আর রক্ষক রাজা তার মাথা কেটে রাক্ষসকে দেবে, এটা ভেবেই ছেলেটি মনের দুঃখে হেসেছিল।

এ-কথা শুনে বেতাল ইত্যাদি।

বিংশ গল্প

বেতাল বলল, মহারাজ! বিশালপুর নগরে অর্থদত্ত নামে একজন ধনশালী বণিক ছিল। তার মেয়ের নাম ছিল অনঙ্গমঞ্জরী। শৈশব থেকে এক বালকের সঙ্গে অনঙ্গমঞ্জরীর খুব ভাব ছিল। বড় হলে দুজনেরই ইচ্ছে পরস্পরকে বিয়ে করে; কিন্তু অর্থদত্ত সে-কথা জানত না। লজ্জায় অনঙ্গমঞ্জরী বা ওই বালক নিজেরাও দুজনে দুজনকে তাদের মনের ইচ্ছে জানায়নি। অর্থদত্ত কমলপুরবাসী মদনদাস নামে এক বণিকের সঙ্গে অনঙ্গমঞ্জরীর বিয়ে দিল। সে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল। বালকটির সঙ্গে তার আর দেখা হলো না।

কিছুদিন পর অনঙ্গমঞ্জরীর স্বামী বাণিজ্য করতে বিদেশে চলে গেল! একদিন সে কাজকর্ম সেরে জানালায় দাঁড়িয়ে আছে; দেখল, সেই ছেলেটি পথ দিয়ে যাচ্ছে। ছেলেটিও তাকে দেখতে পেল। তখন দুজনের মনেই খুব দুঃখ হলো; কিন্তু কেউ কারও সঙ্গে কথা বলল না। ছেলেটি চলে গেলে অনঙ্গমঞ্জরী মাটিতে পড়ে কাঁদতে লাগল।

শ্বশুরবাড়িতে অনঙ্গমঞ্জরীর এক সখি ছিল। দুজনে খুব ভাব; কিন্তু অনঙ্গমঞ্জরী তাকেও এতদিন ছেলেটির কথা বলেনি। আজ অনঙ্গমঞ্জরীকে কাঁদতে দেখে সখি তাকে আদর করে কারণ জিজ্ঞেস করল। অনঙ্গমঞ্জরী প্রথমে বলতে না চাইলেও সখির পীড়াপীড়িতে সব কথা খুলে বলল। সখি তখন তাকে অনেক বোঝাল, অনেক সান্ত্বনা দিল, কিন্তু অনঙ্গমঞ্জরী কিছুতেই শান্ত হলো না।

অনঙ্গমঞ্জরীর সখির সঙ্গেও ছেলেটির সামান্য পরিচয় ছিল। সে বিদেশি হলেও তাদের গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়িতে মাঝে মাঝে আসত। সখি

বুঝল, অনঙ্গমঞ্জরী আর বাঁচবে না। এই সময় অনঙ্গমঞ্জরীর সঙ্গে ছেলেটির একবার দেখা করালে ভাল হয়। সে তৎক্ষণাৎ ছেলেটির কাছে ছুটল।

ওদিকে অনঙ্গমঞ্জরীকে দেখার পর থেকে ছেলেটিরও মন খারাপ হয়ে ছিল। সখির মুখে অনঙ্গমঞ্জরীর কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে এল; কিন্তু হায়! তার আসার আগেই অনঙ্গমঞ্জরীর প্রাণ বেরিয়ে গেছে। দেখে ছেলেটিও সেখানে পড়ে মারা গেল।

বাড়ির সকলে এই ঘটনা শুনে দুজনকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে, এক চিতায় শুইয়ে আগুন দিল! অদৃষ্টক্রমে অনঙ্গমঞ্জরীর স্বামীও বাড়ি ফিরে এল। সে অনঙ্গমঞ্জরীর মৃত্যুর খবর শুনে শ্মশানে গেল এবং জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণত্যাগ করল।

এই পর্যন্ত বলে বেতাল জিজ্ঞেস করল, মহারাজ! ওই তিনজনের মধ্যে কার ভালবাসা বেশি।

রাজা বললেন, মদনদাসের। কেন?

অনঙ্গমঞ্জরী ও ছেলেটি পরস্পরকে ভালবাসত। সুতরাং একজনের মৃত্যুতে আর একজন প্রাণত্যাগ করবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু অনঙ্গমঞ্জরী অন্য একজনকে ভালবাসত জেনেও মদনদাস তার মৃত্যুতে এমন বেদনা পেল যে, আত্মহত্যা করল। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, তার ভালবাসা বেশি।

এ-কথা শুনে বেতাল ইত্যাদি।

একবিংশ গল্প

বেতাল বলল, মহারাজ! জয়স্থল নগরে বিষ্ণুস্বামী নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল। তার চার ছেলে। ছেলেরা কেউই সচ্চরিত্র ছিল না। প্রথমটি পাশা খেলে সময় কাটাত; দ্বিতীয়টি লম্পট; তৃতীয়টি নির্লজ্জ ও চতুর্থটি নাস্তিক। একদিন ব্রাহ্মণ তাদের চারজনকে খুব বকা দিয়ে বলল, পাশা খেললে লক্ষ্মীছাড়া হয়; লম্পট হলে দুঃখের সীমা থাকে না; নির্লজ্জ লোক যে-কোনও মন্দ কাজ করতে পারে; আর নাস্তিক লোকের কথা মুখে আনলেও অধর্ম হয়।

বাবার বকা খেয়ে ছেলেদের নিজেদের ওপর ঘৃণা হলো। তারা চারজনে আলোচনা করতে লাগল। বলল, ছেলেবেলায় লেখাপড়ায় মনোযোগ দিইনি; সে-জন্য আমাদের এই দুর্দশা। যা হোক, চলো, এখন বিদেশে গিয়ে বিদ্যা

শিখে আসি। তখন চারজনে বিদেশে চলে গেল ও নানা দেশে ঘুরে বিদ্যা শিখল।

তারপর একদিন চারজনেই একসঙ্গে দেশে ফিরে চলল। এক জায়গায় এসে দেখে এক মুচি একটা মরা বাঘের মাংস ও চামড়া নিয়ে চলে গেছে; কেবল বাঘের হাড়গুলো পড়ে আছে।

চার ভাইয়ের একজন হাড় জোড়া লাগানোর বিদ্যা শিখেছে। সে বাঘের হাড়গুলো জোড়া লাগাল। দ্বিতীয়জন মাংস লাগাতে শিখেছিল, সে হাড়ের গায়ে মাংস লাগাল। তৃতীয়জন চামড়া লাগাতে জানত; সে মাংসের ওপর চামড়া লাগাল। আর চতুর্থজন সঞ্জীবনী-বিদ্যার বলে বাঘকে প্রাণ দিল। প্রাণ পেয়ে বাঘ চারজনকেই মেরে ফেলল।

গল্পের শেষে বেতাল জিজ্ঞেস করল, মহারাজ! চারজনের মধ্যে সবচেয়ে বোকা কে?

রাজা বললেন, যে বাঘকে প্রাণ দিয়েছিল।

এ-কথা শুনে বেতাল ইত্যাদি।

দ্বাবিংশ গল্প

বেতাল বলল, মহারাজ! বিশ্বপুর নগরে নারায়ণ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল। একদিন সে ভাবল, আমি এখন বুড়ো হয়েছি। ভাল করে চলতে-ফিরতে-কাজকর্ম করতে পারি না; জীবনও কবে আছে কবে নেই। কিন্তু আমার মরতে একটুও ইচ্ছে হয় না। ইচ্ছে হয়, যুবক হয়ে আবার সংসারের সুখ ভোগ করি; কিন্তু এই জীর্ণ দেহে তো তা সম্ভব নয়। যদি মন্ত্রবলে কোনও যুবকের শরীরে প্রবেশ করতে পারি, তাহলেই আমার ইচ্ছে পূর্ণ হয়। আমি একজনের দেহ থেকে আর একজনের দেহে প্রবেশ করার মন্ত্র জানি। সেই মন্ত্রের বলেই আমি এক যুবকের দেহে প্রবেশ করব। এই ভেবে স্ত্রী, পুত্র, নাতি-নাতনী সবাইকে ডেকে বলল, দেখো, আমি বুড়ো হয়েছি। আর সংসারধর্ম করতে ইচ্ছে হয় না। এ বয়সে কেবল পরকালের চিন্তা করা দরকার। আমি ঠিক করেছি, বনে গিয়ে তপস্যা করব। তোমরা আমায় বিদায় দাও।

সকলে ব্রাহ্মণের মিথ্যে কথায় বিশ্বাস করল। তাকে ছাড়তে সবার মনেই কষ্ট হলো। কিন্তু ব্রাহ্মণ চলে গেল। আরেক দেশে গিয়ে এক যুবকের দেহে প্রবেশ করে, নিজের ইচ্ছে পূরণ করতে লাগল।

বেতাল বলল, মহারাজ! ব্রাহ্মণ নিজের দেহ ছাড়ার সময় কেঁদেছিল; আবার যখন ওই যুবকের দেহে প্রবেশ করে তখন খুব হেসেছিল। এর কারণ কী?

রাজা বললেন, নিজের দেহ ছাড়ার সময় বামুন এই ভেবে কেঁদেছে, আমার বহু যত্নের বহু দিনের আগের পরিবারের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রইল না; আর হেসেছে এই ভেবে যে, এখন থেকে সে তার ইচ্ছে স্বচ্ছন্দে পূরণ করতে পারবে।

এ-কথা শুনে বেতাল ইত্যাদি।

ত্রয়োবিংশ গল্প

রাজা আবার বেতালকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে নিয়ে চলেছেন। বেতাল বলল, মহারাজ! ধর্মপুরে গোবিন্দ নামে এক ব্রাহ্মণের দুই ছেলে ছিল। তাদের একজন ছিল ভোজনবিলাসী, খাদ্যে কোনো দোষ থাকলে আর কেউ ধরতে না পারলেও সে ঠিক ধরে ফেলত, সেই খাবার আর খেত না। দ্বিতীয় ছেলেটি ছিল শয্যাবিলাসী, অর্থাৎ বিছানায় সামান্য দোষ থাকলেও সে বুঝে ফেলত, আর সেই বিছানায় শুতো না। একদিন তাদের এই অসাধারণ ক্ষমতার কথা সেখানকার রাজার কানে গেল। রাজা তাদের এই ক্ষমতার বিষয় পরীক্ষা করার জন্য দুজনকে রাজধানীতে আনালেন। দুই ভাই রাজার সামনে উপস্থিত হলে, রাজা জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কে কোন বিষয়ে বিলাসী?

তারা নিজের নিজের পরিচয় দিলে রাজা প্রথমে ভোজনবিলাসীকে পরীক্ষা করার জন্য পাচককে ডেকে খুব ভাল করে নানারকম খাবার রান্না করতে বললেন। রাজার হুকুমে পাচক খাবার রান্না করল; তার যেমন গন্ধ, তেমনি স্বাদ। রাজা ভোজনবিলাসীকে সেগুলো খেতে বললেন। ভোজনবিলাসী খেতে বসল; কিন্তু আসনে বসেই সে উঠে পড়ল। তারপর রাজার কাছে গেলে রাজা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী, খুব তৃপ্তির সঙ্গে খেয়েছ তো?

সে বলল, না মহারাজ! আমি খেতে পারিনি। রাজা জানতে চাইলেন, কেন? ভোজনবিলাসী জবাব দিল, ভাতে মড়ার গন্ধ ছিল। বোধহয় শ্মশানের কাছের খেতের চাল রান্না করা হয়েছিল।

তার কথা শুনে রাজা ভাণ্ডারীকে ডেকে চালের বিষয়ে খোঁজ নিতে বললেন। ভাণ্ডারী খোঁজ নিয়ে জানাল, ভোজনবিলাসী ঠিকই বলেছে, তার

জন্য শ্মশানের ধারের খেতের চাল রান্না করা হয়েছিল। রাজা খুশি হয়ে ভোজনবিলাসীকে বললেন, তুমি সত্যিকারের ভোজনবিলাসী।

তারপর শয্যাবিলাসীর পরীক্ষা আরম্ভ হলো। রাজা তার জন্য একটা সুন্দর শয়নঘরে দুধের মতো ধবধবে সাদা ও পালকের মতো নরম অতি সুন্দর বিছানা পাততে আদেশ দিলেন। বিছানা পাতা হলে শয্যাবিলাসী রাজার আদেশে তাতে শুলো; কিন্তু বেশিক্ষণ শুয়ে থাকতে পারল না, উঠে এসে রাজাকে বলল, মহারাজ! বিছানার সপ্তম তলে একটা ছোট চুল আছে। সে-জন্য আমার শুতে বড় কষ্ট হচ্ছে, শুয়ে থাকতে পারলাম না।

রাজা তৎক্ষণাৎ শোবার ঘরে গিয়ে বিছানা তুলে দেখতে পেলেন, সত্যিই তাই। রাজা তখন তার যথেষ্ট প্রশংসা করলেন এবং দুজনকে প্রচুর পুরস্কার দিয়ে বিদায় করলেন।

গল্প শেষ করে বেতাল জিজ্ঞেস করল, মহারাজ! ওই দুজনের মধ্যে কার বোধশক্তি বেশি?

রাজা বললেন, আমার মতে শয্যাবিলাসীর।

এ-কথা শুনে বেতাল ইত্যাদি।

চতুর্বিংশ গল্প

বেতাল বলল, মহারাজ! আর একটা গল্প শুনুন। কলিঙ্গদেশে যজ্ঞশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল। বহুদিনের আরাধনায় দেবতার বরে তার একটা ছেলে হয়। ছেলেটি অল্পদিনের মধ্যেই সব শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে বাবা-মা'র সেবা করতে থাকে। কিন্তু ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর কপাল খারাপ, মাত্র আঠার বছর বয়েসে ছেলেটি হঠাৎ করে মারা গেল। তারা ছেলের জন্য অনেক কেঁদেকেটে তাকে সৎকার করার জন্য গ্রামের শেষে শ্মশানে নিয়ে গেল।

এই শ্মশানে এক যোগী বহুকাল ধরে তপস্যা করছে। সে ব্রাহ্মণ ছেলেটির লাশ দেখে ভাবল, আমি বুড়ো হয়েছি। শরীর ভেঙে পড়ছে; এজন্য কোনও কাজকর্ম করতে পারি না। যদি এই দেহ ছেড়ে ওই ছেলেটির শরীরে ঢুকি, তাহলে অনেককাল যোগাভ্যাস করতে পারব।

যোগী মৃত ছেলেটির শরীরে প্রবেশ করল। ছেলেটিও বেঁচে উঠল। ব্রাহ্মণ ছেলেটিকে বেঁচে উঠতে দেখে প্রথমে খুব খুশি হয়ে হাসল, তারপর কাঁদতে লাগল।

বেতাল জিজ্ঞেস করল, মহারাজ! ব্রাহ্মণ কেন হাসল, তারপর আবার কাঁদলই বা কেন?

রাজা বললেন, ব্রাহ্মণ প্রথমে হেসেছিল, ছেলেটিকে বেঁচে উঠতে দেখে খুশি হয়ে। কিন্তু সে-ও যোগীর মতো পরের দেহে ঢোকার বিদ্যা জানত। যখন বুঝল, ছেলেটি নয়, তার মৃত শরীরে যোগী ঢুকেই তাকে সচল করেছে, তখন কাঁদতে লাগল।

এ-কথা শুনে বেতাল ইত্যাদি।

পঞ্চবিংশ গল্প

বেতাল বলল, মহারাজ! দাক্ষিণাত্যে ধর্মপুর নগরে মহাবল নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর খুব প্রতাপ ছিল; কিন্তু একদিন অন্য এক শক্তিশালী রাজা অনেক সৈন্যসামন্ত নিয়ে এসে রাজা মহাবলের রাজধানী ঘিরে ফেললেন। দুই রাজার ঘোর যুদ্ধ হলো। রাজা মহাবল যখন বুঝলেন, তিনি পরাজিত হবেন, তখন তাঁর রানী ও মেয়েকে নিয়ে বনে চলে গেলেন। চলতে চলতে তিনজনেই ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ল। তখন রানী ও মেয়েকে এক গাছের তলায় বসিয়ে রেখে, রাজা বনে ফলমূল জোগাড় করতে চলে গেলেন।

তারপর সন্ধ্যা হয়ে এল। রাজা তবুও ফেরেন না। রানী ও রাজকন্যা রাজার কথা ভেবে শঙ্কিত হলো। দুর্ভাবনা হতে লাগল।

ওইদিন কুণ্ডিনের রাজা চন্দ্রসেন বড় রাজকুমারকে নিয়ে ওই বনে শিকারে গিয়েছিল। তারা এমন গহীন বনে মানুষের চিহ্ন দেখে অবাক হলো। ভাল করে দেখে রাজা বললেন, চিহ্ন দেখে মনে হয় দুজন মেয়েমানুষ অল্পক্ষণ আগেই এখান দিয়ে হেঁটে গেছে। চলো, খুঁজে দেখি।

খুঁজতে খুঁজতে কিছুদূর গিয়ে তারা একটা গাছের নীচে রানী ও রাজকন্যাকে দেখতে পেল। তাদের রূপে চারপাশের বন আলোকিত; কিন্তু তাদের মুখ বড় মলিন। দেখে রাজা ও রাজকুমারের মনে দয়া হলো। তারা রানী ও রাজকন্যাকে অভয় দিয়ে রাজধানীতে নিয়ে গেল। কিছুদিন অপেক্ষা করার পরও যখন মহাবল ফিরলেন না, তখন রাজা রাজকন্যাকে এবং রাজকুমার রানীকে বিয়ে করল।

গল্প শেষ করে বেতাল জিজ্ঞেস করল, মহারাজ! ওই দুজনের ছেলে হলে, তাদের কী সম্পর্ক হবে বলুন।

রাজা বিক্রমাদিত্য বেতালের প্রশ্ন শুনে ঈষৎ হেসে চুপ করে রইলেন।

www.alorpathsala.org

উপসংহার

বেতাল বলল, মহারাজ! আমি আপনার সাহস ও অধ্যবসায় দেখে খুবই সন্তুষ্ট। এখন আপনাকে কিছু উপদেশ দেব। মন দিয়ে শুনুন। যে সন্ন্যাসী আপনাকে লাশ আনতে পাঠিয়েছেন, তার নাম শান্তশীল। সে জাতিতে কুমার। আর যে লাশ আপনি বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন, এটা রাজা চন্দ্রভানুর। আমি বেতাল, লাশের মধ্যে ঢুকে বসে আছি। সন্ন্যাসী যোগবলে চন্দ্রভানুকে মেরে ফেলেছে। এখন আপনাকে মারতে পারলেই তার মন্ত্রসিদ্ধি হয়। এজন্য আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি। সে পূজা শেষ করে আপনাকে বলবে, মহারাজ! দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করুন! আপনি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে গেলেই খড়্গ দিয়ে আপনার মাথা কেটে ফেলবে। তাই আপনি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম না করে বলবেন : আমি রাজা। কোনকালে কাউকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিনি; কী করে প্রণাম করতে হয় জানি না, দেখিয়ে দিন। যোগী যেই আপনাকে দেখিয়ে দিতে যাবে, আপনি সঙ্গে সঙ্গে খড়্গ দিয়ে তার মাথা কেটে ফেলবেন। তারপর তার ও চন্দ্রভানুর লাশ দুটো মন্দিরের কাছে উনানের ফুটন্ত তেলে ফেলে দেবেন। ওই সন্ন্যাসী যোগসাধনা করে যে ক্ষমতা অর্জন করেছে, সেটা আপনার মধ্যে চলে আসবে আর আপনি তখন সারা পৃথিবীর সম্রাট হবেন। এই বলে বেতাল চন্দ্রভানুর শরীর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাজা সেই লাশ নিয়ে শ্মশানে সন্ন্যাসীর কাছে উপস্থিত হলে, সন্ন্যাসী বলল, মহারাজ। আপনার ওপর আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। তারপর সে চন্দ্রভানুর মৃতদেহকে বাঁচিয়ে দেবীর সামনে বলি দিয়ে পূজা করে রাজা বিক্রমাদিত্যকে বলল, মহারাজ! দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করুন।

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, আমি রাজা। কোনদিন কাউকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিনি। কী করে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে হয় জানি না, দেখিয়ে দিন।

সন্ন্যাসী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে রাজাকে যেই দেখাতে গেল, রাজা দেবীর সামনে খড়্গ দিয়ে এক কোপে সন্ন্যাসীর মাথা কেটে ফেলল।

এই ঘটনায় দেবতারা খুশি হয়ে স্বর্গ থেকে রাজার মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করল। দেবলোক থেকে ইন্দ্র এসে বলল, রাজা, আমি তোমার সাহসে সন্তুষ্ট হয়েছি; বর প্রার্থনা করো।

রাজা বললেন, প্রভু। আপনার দয়ায় আমার কিছুরই অভাব নেই। তবে এই বর চাই—যতদিন চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী থাকবে, ততদিন যেন আমার এই কাহিনী লোকের মুখে মুখে ফেরে।

দেবরাজ তথাস্তু বলে অদৃশ্য হলো।

রাজা তখন মন্ত্র পড়ে সেই ফুটন্ত তেলে চন্দ্রভানু ও সন্ন্যাসীর লাশ ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে তাল-বেতাল নামে দুই বিকটাকার জোয়ান পুরুষ তার সামনে উপস্থিত হয়ে জোড়হাতে জিজ্ঞেস করল, কী হুকুম মহারাজ?

রাজা বললেন, এখন তোমাদের দরকার নেই; কিন্তু যখনই ডাকব তখনই চলে আসবে।

তাল-বেতাল জো হুকুম মহারাজ বলে চলে গেল।

রাজা বিক্রমাদিত্যও সন্তুষ্টমনে রাজধানীতে ফিরে এসে পৃথিবীর অপরাজেয় সম্রাট হয়ে সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন।

শেষ

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

www.alorpathsala.org

আলোর পাঠশালা

School of Enlightenment

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এই বইটি 'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'র

অন্তর্ভুক্ত।

বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র